# মুসলমানের তেত্রিশ কোটি দেবতা

"জ্ঞান-বিকাশ", "ইসলাম ও ইহার শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ"
ও "কোর্‌আন প্রবেশিকা" প্রণেতা

## মোহাম্মদ তৈমুর

প্রণীত ও প্রকাশিত।

সন ১৯৩৮ সাল

প্রকাশক ঃ—মোহাম্মদ তৈমুর
বাহাদুর বাজার
দিনাজপুর

মুদ্রক ঃ—সুরেশ চন্দ্র দাস এম-এ
অবিনাশ প্রেস
( জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# বিছ্মিল্লাহির্ রাহ্মানির্ রহিম

দাসের উচিত ছিল তার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মঠভাবে সমাজের সেবা করা কিন্তু কারণ বিশেষে ও অবস্থা বিপর্য্যয়হেতু তা সম্ভবপর বিবেচিত না হওয়ায় তাকে বাধ্য হয়ে নির্জ্জনে অন্যপ্রকারে সমাজের কথঞ্চিৎ সেবার ব্যবস্থা কর্তে হয়েছে।

এই ব্যবস্থার অন্যতম ফল হচ্ছে এই "মুসলমানের তেত্রিশ কোটি দেবতা" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকের সঙ্কলন। তাই, ইহা সমাজের খেদমতে অর্পণ ক'রে দাসের একান্ত আশা ও বিনীত মিনতি যে সমাজ তার অক্ষমতা ও ত্রুটি মার্জ্জনা করতঃ তার নগণ্য তাবেদারীর ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর নিদর্শন স্বরূপ ইহা গ্রহণ ক'রে তাকে চির কৃতার্থ ও বাধিত কর্বে।

গ্রন্থকার

# মুখবন্ধ

জেয়ারৎ ও পীর উভয়ই আবশ্যক ও মঙ্গলকর জিনিষ কিন্তু দর্‌গা ও মাজারের অধিকাংশ সেবাইতের এবং অধিকাংশ পীরের অজ্ঞতা, অযোগ্যতা ও মানসিক দুর্ব্বলতা তথা অধিকাংশ জেয়ারৎ-কারীর ও সাধারণ মুরিদানের অজ্ঞতা, অযোগ্যতা ও কুশিক্ষা, গতানুগতিকতা ও অন্ধ-অনুকরণ-প্রিয়তা, জেয়ারৎ ও পীর জিনিষটাকে এত নগণ্যতা ও অনিষ্টকারিতায় পরিণত করেছে যে অগৌণে উহাদের প্রতিকার করা সমাজের পক্ষে আশু কর্ত্তব্য হ'য়ে দাঁড়া'য়েছে। অভিজ্ঞ জেয়ারৎকারীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়, অনভিজ্ঞ জেয়ারৎকারীর সংখ্যাই অত্যধিক। এই অনভিজ্ঞ জেয়ারৎকারীরাই জেয়ারতের উদ্দেশ্য ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে এবং দর্‌গা ও মাজার এদের পক্ষেই ইমান নষ্ট করার ফাঁদ বিশেষ হয়েছে।

সেইরূপ সাধারণ মুরিদানের সংখ্যাই অত্যধিক এবং ইহারাই অর্থলোভী, মতলববাজ পীর ফকিরদিগের হাতের খেলার পুতুল। এই সকল অনভিজ্ঞ মুরিদানেরা এমন সমস্ত বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করে যা মোছলমানী আকিদার বিরোধী। এদের অনেকেই মুরিদ হয় এই বিশ্বাসে যে শরিয়তের সম্যক পায়াবন্দী না কর্‌লেও তাদের বিশেষ ক্ষতি হবেনা, তাই তারা মুরিদ হ'য়ে একরকম নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকে, হুজুর পীর সাহেব কেবলার উপর নির্ভর ক'রে। আমরা দৃঢ় কণ্ঠে বল্‌ছি যে মুরিদানের চিত্ত বিশুদ্ধ ও বিবেক নির্ম্মল করা 'যে সে সাধারণ ও

ব্যবসাদার পীরের' সাধ্যাতীত ;—মুরিদানকে নিজেই ষড়রিপুর দমন ক'রে, শরিয়ত মত চ'লে তার চিত্ত ও চরিত্র বিশুদ্ধ কর্‌তে হবে, সদা সত্যপথে চ'লে বিবেককে নির্ম্মল ও পূর্ণ অবস্থায় আন্‌তে হবে, অন্যথা পীর ধর আর যাই কর সব অনর্থক ; কেননা, আল্লাহ্ আল্ কোর্‌আনের সুরা বকরের ১১২ আয়েতে ও সুরা নাজেয়াতের ৪০ ও ৪১ আয়েতে বলেছেন যে তাদের স্বর্গের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। পুনশ্চ সুরা তওবার ৯৯ আয়েতে তিনি বলেছেন যে তাঁর রহ্‌মত্ সকলের জন্যই সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে, যে তা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে, সে পায়—অর্থাৎ তাঁর রহ্‌মত্ সূর্য্য কিরণের মত উন্মুক্ত, অবরোধের বাহিরে আস্‌লেই তা পাবে। পুনরপি উক্ত সুরার ১০৮ আয়েতে তিনি বলেছেন যে যারা পবিত্র হ'তে ভালবাসে তাহাদিগকে তিনি পছন্দ করেন এবং সুরা মোজ্জাম্মেলের ৯ আয়েতে তিনি তাদিগকে তাঁকেই পরামর্শ প্রদানের জন্য উকিল ধর্‌তে আদেশ করেছেন। সুরা এম্‌রানের ৬৪ আয়তে তাঁকে ব্যতীত মানুষের মধ্যে কাহাকেও প্রভু ও পথ প্রদর্শক রূপে গ্রহণ কর্‌তে তিনি স্পষ্টতঃ নিষেধ করেছেন এবং সুরা নেসার ১২৩ আয়েতে বলেছেন যে যারই সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত কর, তাতে কোন ফল দর্শিবে না, দুষ্কর্ম্মফল ভোগ কর্‌তেই হবে। পুনশ্চ সুরা তহ্‌রিমে আল্লাহ্ হজরত রছুলে করিমের বিবীদিগকে ও তৎসঙ্গে সমস্ত বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনী নর নারীকে স্পষ্টবাক্যে সতর্ক ক'রে দিয়াছেন যে আল্লাহ্-ভক্ত না হ'লে ও তাঁর আদেশ পালন না কর্‌লে পয়গাম্বরের সহিত সম্পর্কিত ও সম্পর্কিতা হলেও তাঁদের নিস্তার নাই এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপে হজরত নুহের পুত্র ও হজরত লুতের স্ত্রীর উল্লেখ করেছেন। অথচ এরূপ সতর্কবাণী ও নজির বর্ত্তমানেও এমন এক শ্রেণীর মুরিদান আছে যারা আল্লাহ্‌র আদেশ যথাযথ পালন না করেও আশা করে

যে হুজুর পীর সাহেব কেবলারা তাদের একটা সদ্গতি ক'রে দিবেনই। পথ-ভ্রান্তদিগের জন্য ইহা যে সুস্পষ্ট সতর্কবাণী ও সুপথের পরিষ্কার ইঙ্গিত তা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। এক্ষণে সরল পথ ( সেরাত্তিম্ মোস্তাকিম্ ) লাভেচ্ছু যাঁরা তাঁদের চাই কেবল আল্লাহে দৃঢ় বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসে প্রণোদিত হয়ে রাস্তা ধরা। পরিশ্রমে বিমুখ যারা তারাই কেবল পথের কষ্ট দেখে ভয় পায়, কিন্তু তাদেরকে সর্ব্বদা মনে রাখ্তে হবে যে আধ্যাত্মিক পথের পথিককে হাঁট্তেই হবে, গত্যন্তর নাই। বঙ্গদেশের কাণ্ড-জ্ঞান-হীন অর্থ-লোভী সাধারণ পীর ও ফকিরেরা তাদের কার্য্যকলাপের হেতু সমাজের এক প্রকার উৎপাত হয়ে দাঁড়ায়েছে। বর্ত্তমানে এই মাজার ও পীর ফকির ব্যপার এরূপ ভীষণ আকার ধারণ করেছে যে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা উত্যক্ত হ'য়ে পড়েছেন এবং এজন্য তুমুল আন্দোলন আবশ্যক হয়েছে ব'লে মনে করেন।

অধম স্বল্পজ্ঞান ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি হ'লেও আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সাহসে বুক বেঁধে অগ্রসর হ'য়েছে, এই বিশ্বাসে যে তার এই ক্ষুদ্র পুস্তকই আল্লাহ্ চাহেত সেই আন্দোলনের সূত্রপাত কর্‌বে। যাঁরা ইহা পেতে ইচ্ছা করেন, বুকপোষ্টে পাঠানের নিমিত্ত ডাক টিকিট সহ গ্রন্থকারকে পত্র লিখ্‌লে বিনা মূল্যে ইহা পেতে পারেন।

এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ কর্‌ছি যে আমার প্রিয় বন্ধু মৌলবী জমিরুদ্দীন আহাম্মদ সাহেব, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার, একজন খ্যাতনামা আলেম ও দিনাজপুর ষ্টেশন মস্‌জিদের এমাম, অনুগ্রহ ক'রে পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত দে'খে দিয়েছেন।

গ্রন্থকার

# মুসলমানের তেত্রিশ কোটি দেবতা

ولا تزر وازرة وزر اخرى *

"যার নিজেরই বোঝা আছে, সে অন্যের বোঝা বহন কর্‌বে না।"—সুরা বানি ইস্রাইলের ১৫ আয়েত, সুরা নজ্‌মের ৩৮ আয়েত, সুরা ফাতেরের ১৮ আয়েত ও সুরা আন্‌আমের ১৬৫ আয়েত—কোর্‌আন।

আপনারা জানেন কি এ সমস্ত দেবতা কে? এবং এদের লক্ষ্য কি? এরা (বা এদের পক্ষে এদের সেবাইতরা) একমাত্র সত্য সনাতন আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব দাবী করে, এবং স্বশ্রেণীর দেবতাদের মধ্যে স্বীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে। দেবতা শব্দের উল্লেখ করায় চমকিত হবেন না, বা এতে ভ্রূভঙ্গির কোন কারণ নাই। ইহা আমাদের কথা নহে, ইহা পবিত্র ঐশী মহাগ্রন্থ কোর্‌আনের 'আলেহা' শব্দের বঙ্গানুবাদ মাত্র। আমরা এস্থলে যাঁদের বিষয়ে উল্লেখ কর্‌ছি কেবল তাঁরাই ইহার অন্তর্ভুক্ত নহেন, এমন কি মানুষের কুপ্রবৃত্তি গুলিকেও পবিত্র কোর্‌আন দেবতার অন্তর্ভুক্ত করেছে :—

ارءيت من اتخذ الهه هوه *

—সুরা ফোর্‌কানের ৪৩ আয়েত।

পীর, অলি, দরবেশ আদির প্রতি অত্যধিক বা অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং কুপ্রবৃত্তির দাস হওয়াকেও ইসলাম বহু-আল্লাহ্-বাদ ব'লে নির্দ্দেশ করেছে—সুরা তওবার ৩১ আয়েত দ্রষ্টব্য (আমরা এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ চাহেত উপসংহারে বিস্তৃত আলোচনা কর্‌ব), তবে ৩৩ কোটি এস্থলে বহুত্ব-বাচক শব্দ মাত্র।

আপনারা কি কখনও ভে'বে দে'খেছেন যে ঐশী মহাগ্রন্থ কোর্‌আন আপনাদের জন্য কিরূপ নিখুঁত ও উচ্চাঙ্গের একেশ্বর-বাদ নির্দ্দিষ্ট করেছে? জগতে এরূপ নিখুঁত ও পূর্ণ একেশ্বর-বাদ কুত্রাপি ও কস্মিন কালে প্রচারিত হয় নাই। আমরা উপসংহারে আল্লাহ্ চাহেত এসম্বন্ধে পবিত্র কোর্‌আনের আয়েত সকল উল্লেখ ক'রে বিস্তৃত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হ'ব। একটী কথা যা পূর্ব্বাহ্নেই ব'লে রাখা একান্ত আবশ্যক মনে করি তাহা এই যে, আমরা পীরের আবশ্যকতা অস্বীকার করি না, তবে আমরা কৃত্রিমতার (ইংরাজীতে যাকে Sham বলে তার) বিরোধী। আমরা দেখ্‌তে চাই যে পীর অন্বেষণের পূর্ব্বে প্রথমতঃ আত্মশুদ্ধির ও যোগ্যতা অর্জ্জনের নিমিত্ত যথেষ্ট উদ্যোগ (preparation) করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়তঃ কেবল যোগ্য পীরেরই দীক্ষা লওয়া হচ্ছে। অথবা এক কথায় আমরা চাই যে তথাকথিত পীর নামধারী উৎ-পাতের হাত হ'তে সাধারণ নিরীহ মুসলমানকে রক্ষা কর্‌তে। লোকের

ধারণা যে, পীর দরকার হয় সাধারণতঃ জটিল বিষয়ের মীমাংসার ও বিশেষ ক'রে মারফত শিক্ষার নিমিত্ত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এটা প্রায় কেহ খেয়াল ক'রে দেখেন না যে শরিয়তই হচ্ছে সমস্তের মূল—

ايحسب الانسان ان يترك سدى *

—সুরা কেয়ামতের ৩৩ আয়েত—"মানুষ কি মনে করে যে তাকে অমনি ছে'ড়ে দেওয়া হবে ( হিসাব নিকাশ না নিয়ে )"? অর্থাৎ সে কি মনে করে যে তাকে শরিয়তের অধীন হ'তে হবে না? যে ব্যক্তি শরিয়তে অনভিজ্ঞ বা উহার বড় একটা ধার ধারে না, তার মার্‌ফত জানার চেষ্টা নিতান্তই বিড়ম্বনা। ইংরাজীতে একটা চল্‌তি কথা আছে, বোধ হয় উহাই আমাদের মনের ভাব সুন্দর রূপে প্রকাশ কর্‌বে, তাহা এই:—"To put the cart before the horse." বঙ্গানুবাদ এইরূপ—"ঘোড়ার সাম্‌নে গাড়ী দাঁড় ক'রে দেওয়া"। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনের জন্য কতকগুলি সুব্যবস্থা করেছেন, যা মে'নে চলা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। মানুষের এই কর্ত্তব্য তিন প্রকারের—( ১ ) তার নিজের প্রতি তার কর্ত্তব্য; ( ২ ) তার সৃষ্টি-কর্ত্তা আল্লাহ্‌র প্রতি তার কর্ত্তব্য, ইহাও তারই নিজের মঙ্গলের জন্য; ( ৩ ) তার সৃষ্টি-কর্ত্তা আল্লাহ্‌র সৃজিত জীবের প্রতি তার কর্ত্তব্য, ইহাও পরিণামে তারই জন্য কল্যাণকর হয়।

মুসলমানের নামাজ, জাকাত, রোজা, প্রভৃতি তার জন্য ফর্‌জ্ বা অবশ্য কর্ত্তব্য। এসকলের যথাযথ সম্পাদন তার পক্ষে উক্ত তিন প্রকার কর্ত্তব্য পালনের প্রধান সহায়; নামাজ, জাকাত, রোজা তাকে সংযম শিক্ষা দেয় ও শুদ্ধ করে। এখানে মনে রাখা উচিত যে, উপাসনা ও সেবা পাশাপাশি চলবে; কেন না, সেবাহীন উপাসনা হচ্ছে অঙ্গহীন উপাসনা। এই জন্যই ইসলাম বানপ্রস্থ সমর্থন করে না এবং এই জন্যই পবিত্র কোর্‌আন যেখানে সালাৎ প্রায়শঃ সেইখানেই জাকাতের উল্লেখ করেছে।

পবিত্র মহাগ্রন্থ কোর্‌আন নামাজ সম্বন্ধে বল্‌ছে—
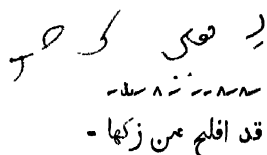
ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر - و لذكر الله اكبر -

"আল্লাহ্‌র স্মরণ বা তাঁর উপাসনার মত অত বড় ভাল কাজ তোমার জন্য আর নাই। ইহা তোমাকে (কুকাজ) কুপথ হইতে নিবৃত্ত করে—অর্থাৎ তোমার পবিত্রতা রক্ষা করে"—সুরা আন্‌কাবুতের ৪৫ আয়েত। পবিত্র কোর্‌আন পুনঃ বল্‌ছে—

و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى - فان الجنة

هى الماوى -

—সুরা নাজেয়াতের ৪০ ও ৪১ আয়েত—"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটে হিসাব নিকাশের ভয় করে এবং তদ্ধেতু কুপ্রবৃত্তি দমন করে বা কুপথ ত্যাগ করে নিশ্চয় সে স্বর্গ-বাসী"। পুনশ্চ পবিত্র কোর্‌আন বল্‌ছে—

قد افلح من زكها -

"যে ব্যক্তি আত্মাকে পবিত্র বা পাপমুক্ত করে সে মুক্তি লাভ করে"—সুরা শাম্‌সের ৯ আয়েত। অতএব নামাজ, জাকাত ও রোজার আবশ্যকতা নিশ্চিত রূপে সপ্রমাণিত হ'ল। পক্ষান্তরে এগুলি আল্লাহ্‌র আদেশ হ'লেও মুসলমানের জেনে রাখা উচিত যে এসকলের সম্পাদন কর্‌লেও আল্লাহ্‌র গৌরব বৃদ্ধি পায় না এবং না কর্‌লেও তাঁর গৌরবের হানি হয় না (এসব করবে মানুষ তার নিজের মঙ্গলের জন্য), কেননা আল্লাহ্‌ই একমাত্র সম্পূর্ণ, নিরবলম্বন এবং সর্ব্ব বিষয়ে অভাব শূন্য; পুনশ্চ "যদি কেহ আল্লাহ্‌কে একমাত্র উপাসনার পাত্র ব'লে স্বীকার না করে এবং বহু-আল্লাহে বিশ্বাসী হয় তাতেও তাঁর কোন ক্ষতি হবে না (মানুষ নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে)"; মানুষ বহু-আল্লাহে বিশ্বাসী হ'লে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত উচ্চ বৃত্তিগুলির বিনাশ সাধন ক'রে যে নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হ'বে, ঐশী গ্রন্থ কোর্‌আন তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বল্‌ছে যে, মানুষ তদবস্থায় বিচারশক্তি হারায়ে একটা অপদার্থ দাসে পরিণত হয়,—

و من يشكر فانما يشكر لنفسه - و من كفر فان الله غني حميد -

—সূরা লোকমানের ১২ আয়েত এবং

و ضرب الله مثلاً رجلين احد هما ابكم يقدر على شئى و هو كل

على مولاه اينما يوجهه لايات بخير -

—সূরা নহলের ৭৫ ও ৭৬ আয়েত। ইহার উপর আর কথা কি ?' এক্ষণে মোক্ষকামীর এগুলি (নামাজ ইত্যাদি) যথাযথ পালন করার সর্ব্বথা চেষ্টা করা উচিত। নিশ্চয় এগুলি জান্‌বার ও বুঝ্‌বার জন্য পীর ফকিরের দরকার হয় না, কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, আল্লাহ্‌র এই সকল প্রধানতম আদেশ ও রছুলে করিমের শ্রেষ্ঠতম উপদেশ পালন করার নিমিত্ত অনেকের বড় একটা আগ্রহ দেখা যায় না, পরন্তু কবরে মন্‌কীর ও নকীর যে যে ছওয়াল কর্‌বে সেগুলির জবাব প্রস্তুত ক'রে রাখার জন্য তারা অতিশয় ব্যগ্র; এটা কেবল মূর্খতা না পাগলামী তা আপনারাই মীমাংসা করুন। আমরা বলি যে, আগে ফরজ্‌ বা অবশ্য কর্ত্তব্যগুলি যথাযথ পালন কর—লোক দেখানোর জন্য না ক'রে কেবল আল্লাহ্‌র মহব্বত ও তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পালন কর এবং এতদ্দ্বারা এমন ভাব আপনাতে আনয়ন কর যেন প্রাণের আবেগে এসকল পালন কর্‌তে বাধ্য হও বা না

ক'রে স্থির থাকতে পার না, তার পর পীরের বা ফকিরের তোমার দরকার হবে কি না, তা তুমিই বুঝ্‌তে পারবে এবং দরকার হ'লে উপযুক্ত পীর চি'নে নেওয়া তোমার পক্ষে একটুও কঠিন হবে না। কেহ কেহ বলেন যে 'হুজুরে কল্‌ব্‌' হওয়ার অর্থাৎ সম্মুখে আল্লাহ্‌ উপস্থিত আছেন এ ধারণা না করতে পারলে প্রকৃত পক্ষে এবাদৎ হয় না, এই জন্যই পীরের দরকার। আমরা বলি যে, এটা পরিশ্রম-বিমুখ লোকের ফাঁকা আওয়াজ। যারা কাজের তত ধার ধারে না, তারাই এরূপ ফাঁকা আওয়াজ করতে বড় অভ্যস্ত। এরা আসল কথা ভুলে যায় যে, সমস্ত জিনিষই 'ফলেন পরিচীয়তে'। বেশত, বঙ্গদেশেত আর পীর ও মুরিদানের অভাব নাই, কিন্তু কয়টা মুরিদান 'হুজুরি কল্‌ব্‌' হয়েছে? আল্লাহ্‌গত-প্রাণ, তাঁর প্রিয়পাত্র সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের কৃপা দৃষ্টি পড়লে হয়ত দিব্য জ্ঞানলাভ হ'তে পারে, 'হুজুরে কল্‌ব্‌' হওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা কি যে সে পীর ও ফকিরের কাজ? বিশেষ ক'রে ব্যবসাদার পীর-ফকিরের ত নহেই। সিদ্ধ মহাপুরুষ সম্বন্ধে আমরা স্থানান্তরে আল্লাহ্‌ চাহেত আলোচনা করব'। 'হুজুরে কল্‌ব্‌' হওয়ার জন্য অনেক কিছু করতে হয়, ইহা বাক্য-বাগীশের কাজ নয়। অন্যমনস্কতাই হচ্ছে 'হুজুরে কল্‌ব্‌' হওয়ার প্রধান অন্তরায়। 'হুজুরে কল্‌ব্‌' হতে হ'লে প্রথমতঃ চাই পবিত্রতা অর্জ্জন করা, যে পবিত্রতার কথা পূর্ব্বে বলা হ'ল এবং ঐ সঙ্গে চাই অন্যমনস্কতার কারণ দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা। একদিন হজরত রছুলে করিমের মনোযোগ গিয়াছিল তাঁর এক সুন্দর জামার দিকে, যে জামা তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছিল,

হজরত তৎক্ষণাৎ ঐ জামা একজনকে দান ক'রে ফেলেন। কথিত আছে, একদিন হজরত তাল্‌হা হজরত রছুলে করিমের নিকট সবিনীত নিবেদন করেন যে নামাজের সময়ে তার অন্যমনস্কতা হচ্ছে, এ-সম্বন্ধে সে কি কর্‌বে? হজরত রছুলে করিম জিজ্ঞাসা কর্‌লেন যে, কোন্ বিষয়ে তার মনধাবিত হয়। হজরত তাল্‌হা উত্তর করেন যে তার বাগানের কথা নামাজের সময়ে মনে পড়ে। হজরত রছুলে করিম বল্‌লেন যে যদি বাগানের চেয়ে আল্লাহ্ অধিকতর ভালবাসার পাত্র হন, তবে বাগানটা কাহাকেও দিয়ে ফেল। সংসারে যত বেশী লিপ্ত হওয়া যাবে, 'হুজুরে কল্‌ব্' হওয়া তত বেশী কঠিন হবে এবং যত বেশী নির্লিপ্ত ভাবে সংসার চালান যাবে, 'হুজুরে কল্‌ব্' হওয়া তত বেশী সহজ হবে। হজরত রছুলে করিম যদি অন্য-মনস্কতার কারণ দূর করার নিমিত্ত স্বয়ং চেষ্টা ক'রে থাকেন, তবে আমাদের কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত তাহাও কি ব'লে দিতে হবে? কেহ কেহ হয়ত বল্‌বেন যে তাহ'লে কি 'হুজুরে কল্‌ব্' হওয়ার জন্য যথাসর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ফকির সাজ্‌তে হবে? আপাত দৃষ্টিতে তাহাই মনে হইতে পারে কিন্তু চিন্তা ক'রে দেখ্‌তে গেলে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে যে আসলে বিষয়টা মোটেই সেরূপ নহে। ইস্‌লাম ফকির সাজ্‌তে নিষেধ করে, যথা সুরা বনি ইস্‌রাই-লের ২৯ আয়েত—"একবারে মুষ্টি বদ্ধ করোনা (বা কৃপণ সেজোনা) বা একদম হাত খুলে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়োনা, উভয়বিধ অবস্থাই নিন্দনীয়", এবং ইস্‌লামে বানপ্রস্থ নাই তাহা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। বিলিয়ে দেওয়া মুখের কথা নহে, ইহা অতীব কঠিন ব্যাপার।

বিলিয়ে দেওয়ার মনোবৃত্তি লাভ করতে জীবনের কত যুগ ব্যাপী কঠোর সাধনার দরকার তা ভেবে দেখার বিষয়। মুখ দিয়ে বললেই বা উপদেশ পেলেই সেরূপ মনোবৃত্তি লাভ করা যায় না, ইহা বাক্য-বাগীশের কাজ নহে, ইহা সাধনার বিষয়। ভাল, বিলিয়ে দেওয়া ত মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ, ইহার উল্লেখ মাত্রেই যদি মানুষের ফকীর সাজার ভয় হয়, তাহ'লে সুদত আল্লাহ্ হারাম ক'রে দিয়েছেন, সে সুদ কয়টা লোকে ছেড়ে দিয়েছে? এই জন্যই বলেছি এগুলি নিষ্কর্ম্মাদিগের ফাঁকা আওয়াজ।

দুঃখের বিষয় আজকালকার দিনে কাজের চেয়ে কথার মূল্য বেশী, বিশেষ ক'রে ধর্ম্মের বেলা। ইংরাজী ভাষায় আমার এক উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু বন্ধু ব'লেছিলেন "My gods are a God." কথায় কথায় ইহার বাঙ্গানুবাদ এই "আমার সমস্ত ঈশ্বরই সেই এক পরমেশ্বর"। বন্ধু যে ভণিতা দিলেন তা ঠিক অদ্বৈতবাদ না হলেও তা উহারই অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকার মতবাদের খণ্ডন করা হয়েছে সুরা এখ্লাসে ও সুরা বকরের আয়তালকুর্সিতে। এখানে এই বললে যথেষ্ট হবে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সমস্তের সমষ্টি আল্লাহ্-ব্যাপক নহে, আল্লাহ্ তারও অধিক—"The Pantheists do not say the whole truth when they say that all things are He, but the whole truth is that all things are His." যাক্, আমি ব'লেছিলাম যে আপনার কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করার মত জ্ঞান আমার নাই, কেননা অংশ যে সমুদয়ের সমান হয় না ইহা আপনার জানা নাই এ বিশ্বাস আমি করতে পারি না এবং অন্য সমস্ত ঈশ্বর

যদি অংশ না হয়ে তাঁর সমান হয় তা হ'লে আপনার সেই এক পরমেশ্বর 'অদ্বিতীয়' কিরূপে হতে পারেন তা আমার জ্ঞানের বহির্ভূত। পুনশ্চ অংশ সম্পূর্ণ হ'তে ক্ষুদ্রতর ব'লে উহা কখনই সম্পূর্ণের মত পূর্ণ ক্ষমতাবান হতে পারে না। অংশ যতই ক্ষুদ্রতর হবে উহার ক্ষমতাও ততই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং অংশীবাদীরা পূর্ণ জিনিষটার উপাসনা করে না, কিন্তু ভ্রান্ত ধারণা ও ভ্রান্তি-মূলক যুক্তি তাদের চিত্ত অধিকার ক'রে আছে ব'লে তারা এই সহজ সত্যের উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌ছে না। আল্লাহ্ সত্যই বলেছেন যে এই অর্ব্বাচীন দিগের হেতুবাদ এই প্রকারেরই হয়ে থাকে, কাজেই সত্য এদের হ'তে ক্রমশঃই দূরে সরে পড়েছে, এরা সত্য পাবে না। এদের আর একদল আছে যারা বলে "উপাসনার আবশ্যকতা কি? সৎকাজ কর"—এরা দুনিয়ায় আমাকে আমলে আন্‌তে চায় না। ভাল, এরা যা মুখে বলে তাকি কখন এরা স্থির চিত্তে চিন্তা ক'রে দেখেছে? এইযে ভাল কাজ এরা কর্‌তে চায়, তা কেন এরা কর্‌তে চায়? এদের অন্তঃকরণ ভাল কাজ কর্‌তে এদিগকে প্রণোদিত করে কেন, তাকি এরা চিন্তা ক'রে দেখে? ইহা কি কাহারও অনুমোদন (approbation) বা বাহাবা লাভের জন্য নয়? তা সে ব্যক্তি দুনিয়ার লোকই হউক, এদের অন্তরাত্মাই হো'ক আর যেই হো'ক। আমি বল্‌ছি এরা ঠিক ঠাওরাতে পার্‌ছেনা, প্রকৃত জিনিষটা ধর্‌তে পার্‌ছেনা, এরা বিভ্রান্ত হ'য়ে প'ড়েছে নতুবা এরা বুঝ্‌ত যে আমারই অনুমোদনের জন্য এরা লালায়িত; কেননা, কি ইহ কি পরকাল, উভয়ত্র আমিই একমাত্র পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের

মালিক। এরা যেন মনে রাখে যে দুনিয়ায় যেমন এরা আমাকে আমলে আন্‌ছে না, এরা যখন পুরস্কার প্রার্থী হবে, সাহায্য প্রার্থনা কর্‌বে, দয়া ভিক্ষা কর্‌বে, তখন আমিও তেমনি এদিগকে আমলে আন্‌ব না। এদের জন্য ইহকালে অশান্তি এবং পরকালে একমাত্র নরকাগ্নি। কি ভয়ানক কথা!— সুরা ইব্রাহিমের ১৮ আয়েত, কোর্‌আন। বাস্তবিক, প্রকৃত ধারণার চেষ্টা যারা করে না, প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধানে যারা নারাজ, প্রকৃত কাজের ধার যারা ধারে না, তারা এইরূপ ভণিতা দিতেই মজবুত। আরও দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে সংসারে কতক লোক উন্মিলিত নেত্রে চলে আর কতক লোক চক্ষু মুদ্রিত করে চলে। যারা চক্ষু মুদ্রিত ক'রে চলে তারা সংসারের অনেক কিছুই দেখ্‌তে পায় না। পুনশ্চ পূর্ব্ব হ'তে কোন সংস্কার বা ধারণা নিয়ে যারা চলে তাদের মনশ্চক্ষু মুদ্রিত থাকে, কাজেই তাদের দ্বারা অনেক স্থলেই সুবিচার হয় না। আল্লাহ্‌ বলেছেন "তাদের অন্তঃকরণ আছে কিন্তু তদ্দ্বারা তারা বুঝ্‌তে চেষ্টা করে না, চক্ষু আছে তদ্দ্বারা দেখে না, কর্ণ আছে তদ্দ্বারা শুনে না; তারা পরিণাম চিন্তা করে না"— সুরা আরা'ফের ১৭৯ আয়েত।

কবর বা মাজার জেয়ারতের একটা ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু অনেক স্থলে ইহার উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পরিণত হয়। পীর, অলী ও দরবেশের কবর 'মাজার' নামে আখ্যাত হয়, এই খানেই অতিভক্তি, পারি-পার্শ্বিকতা ও গতানুগতিকতার হেতু জেয়ারত ভিন্ন আকার ধারণ করে—কবরে সমাহিত ব্যক্তিদিগের আত্মার কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করাই জেয়ারতের উদ্দেশ্য, কিন্তু পীর, অলী,

দরবেশ প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের মাজার জেয়ারতের বেলা তা না ক'রে মাজারে সমাহিত ঐ মহাপুরুষদিগের নিকটেই প্রার্থনা করা হয় প্রার্থনাকারীর মনস্কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত, যাহা জেয়ারতের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ এবং পাপজনক। হেডিং বা সূচনা স্বরূপে আমরা যে আয়েত উদ্ধৃত করেছি তাহা হচ্ছে বয়েতগ্রহণকারী ও মুরিদান উভয়ের জন্যই সতর্কবাণী। আমরা এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ চাহেত যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করব। এই সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনার পরে, এক্ষণে বক্তব্য বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

দর্গা ও মাজার—প্রত্যেক দর্গা ও মাজারের সেবাইত আছে, এদের কাজ হচ্ছে সময়ে অসময়ে যখনই হউক সুবিধামত কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ হ'লেই দর্গা ও মাজারে সমাহিত মহাপুরুষদিগের অলৌকিক ক্ষমতার উল্লেখ করা এবং তাঁরা যে সিদ্ধপুরুষ ও লোকের প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রে থাকেন তা বিশেষ ক'রে ব'লে দেওয়া। এদের মানসিকতা অনুধাবন কর্তে চেষ্টা করলে দেখ্তে পাবেন যে এরা হিন্দুদের দেবদেবীর মঠ ও মন্দিরের সেবাইতদিগের সহিত এক ভাবাপন্ন, পার্থক্য মোটেই নাই।

যাঁরা "লায়লাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ্" অর্থাৎ এক আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য (প্রার্থনার পাত্র) নাই এবং হজরত মোহম্মদ (দঃ) তাঁর প্রেরিত (নবি) এই কলেমা (বাক্য) উচ্চারণ করেন এবং তা অন্তরের অন্তস্তল হ'তে বিশ্বাস করেন, আপনারা যদি তাঁদের দলভুক্ত ব্যক্তি ব'লে দাবী করেন, তা'হলে এসকল লোকের ক্রিয়া-কলাপের জন্য নিশ্চয়ই আপনারা লজ্জা বোধ না ক'রে পারবেন না। যদি

তাই হয় তবে কি ইহার প্রতিকার কল্পে আপনাদের কোন কর্ত্তব্য নাই? দৈবক্রমে হয়ত আপনারা দর্‌গা ও মাজারে এমন লোককেও দেখ্‌তে পাবেন, যারা ৫ বার রীতিমত নামাজ পড়ে অথচ এরাও সিন্নি দিয়ে বা মানত ক'রে তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার জন্য করযোড়ে প্রার্থনা কর্‌ছে। যাঁরা প্রত্যেক নামাজে "ইয়াকানাবোদো ওয়া ইয়াকানাস্তাইন" অর্থাৎ "কেবল তোমারই আমরা উপাসনা করি এবং কেবল তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি" ব'লে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন এবং উহার অর্থ সম্যক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন; আপনারা যদি তাঁদের দলভুক্ত ব্যক্তি ব'লে দাবী করেন, তা'হলে কি এই দৃশ্যে আপনাদের হৃদ্‌কম্পন উপস্থিত হবে না? যদি তা হয়, তাহ'লে এপ্রকারের অনভিজ্ঞ সাদাসিদে পথভ্রষ্ট মুসলমান বেচারাদের আত্মার কল্যাণের জন্য কি আপনাদের চেষ্টিত হওয়া উচিত নয়? এই সমস্ত দর্‌গা ও মাজার অশিক্ষিত সাদাসিদে মুসলমানদিগের ইমান নষ্ট করার ফাঁদ বিশেষ। শয়তান, জীবদিগের পুনরুত্থান (কেয়ামত) পর্য্যন্ত সময় পে'য়ে আল্লাহ্‌কে বলেছিল "আমি অত্যল্প সংখ্যক ব্যতীত আদমের সমস্ত বংশধরকেই আমার বশীভূত ক'রে ফেল্‌ব"—সুরা বনিইস্রাইলের ৬২ আয়েত ও সুরা হেজরের ৩৯ আয়েত। এই সকল সেবাইত নিশ্চয়ই ছদ্মবেশধারী সেই শয়তান বা তার চেলা। আর দুঃখের বিষয় এই যে অশিক্ষিত মুসলমানেরা অতি সহজে এদের হাতে পতিত হয় এবং মুসলমানদিগের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যাই অত্যধিক। এ ব্যাপার এতদূর গড়া'য়েছে যে অনভিজ্ঞ লোকে বেদাতের ত কথাই নাই, অনবধানতা বশতঃ শির্ক পর্য্যন্ত ক'রে বস্‌ছে। এবার

(১৯৩৪ সনে) হজ্জ উপলক্ষে মক্কা ও মদিনা শরিফে কবর ও মাজার জিয়ারত কর্‌তে গিয়ে যে দৃশ্য অবলোকন করেছি, তাতে অন্তঃকরণে বিষম ব্যথা পেয়েছি। যেখানে যেখানে জিয়ারত কর্‌তে গিয়েছি সেইখানেই কবর ও মাজারকে ভগ্নাবস্থায় দেখ্‌তে পেয়েছি। জেদ্দাতেত উদ্দেশে জেয়ারত কর্‌তে হ'য়েছিল, কেননা সেখানে কবর ও মাজারকে উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত ক'রে রাখা হ'য়েছে। স্বভাবতঃই মনে এই বিসদৃশ ব্যাপারের কারণ অবগত হওয়ার নিমিত্ত একটা ব্যগ্রতা জন্মেছিল, জান্‌তে পারা গে'ছে যে বেদাত ও শির্কের জড় উৎপাটন করার মানসে হেজাজের রাজা সুলতান এব্‌নে সাউদ অনেক কবর ও মাজার অক্ষত অবস্থায় রাখেন নাই, প্রত্যেক স্থানে প্রহরী নিযুক্ত রেখেছেন এবং কেবল তাঁর অধীনস্থ মোআল্লেমদিগের নিযুক্ত ব্যক্তি (ছবী) দ্বারা নির্দ্দিষ্ট দোওয়া দরুদ পাঠের ব্যবস্থা করেছেন। আমার সৌভাগ্য বশতঃ আরফাত্‌ হ'তে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মিনায় অবস্থান কালে ও মদিনা মনওয়ারায়ে এ বিষয়ের প্রকাশ্য সমালোচনার সুযোগ ঘটেছিল। সমালোচনায় নিযুক্ত প্রায় সকলের মতে সুলতান এব্‌নে সাউদের উদ্দেশ্য সাধু হ'লেও কবর ও মাজার ভগ্নরূপ কার্য্য অধিকাংশ মুসলমানের মনঃকষ্টের কারণ হ'য়েছে ব'লে সাব্যস্ত হয়। কবর ও মাজার ভাঙ্গার ও তাহাদিগকে উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত ক'রে রাখার পরিবর্ত্তে এ অধম ঐ সমস্তকে তার দিয়ে ঘেরার পক্ষপাতী ব'লে মত প্রকাশ ক'রেছিল। এই প্রসঙ্গে হিন্দুস্থানের জনৈক আলেম আজমীর শরীফের ব্যাপার সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে ব'লেছিলেন যে হিন্দুস্থানের জন্য একজন এব্‌নে সাউদের একান্ত আবশ্যকতা হয়েছে।

এইরূপ কথা প্রসঙ্গেই পীর-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় তাহাতে একজন নামজাদা মোআল্লেম মন্তব্য প্রকাশ করেন যে বাঙ্গালা দেশের মত পীরের এত ছড়াছড়ি ( বাহুল্য ) কুত্রাপি নাই। বাস্তবিক, হতভাগ্য বঙ্গদেশে মুড়ি, মিছরি সবই একদরে বিকায়।

আল্লাহ তাঁর বাণী সম্বলিত মহাগ্রন্থ কোর্‌আনের সুরা তওবার ১৮ ও ১৯ আয়েতে বলেছেন—"যে ব্যক্তি আল্লাহে ও শেষ হিসাব নিকাশের দিনে বিশ্বাস করে, নামাজ পড়ে, জাকাত দেয় এবং এক আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহাকেও ভয় করে না, সে ব্যতীত অপরে আল্লাহ্‌র গৃহের হেফাজতের অধিকারী নহে। অতএব ইহা সকলকে অবহিত ক'রে দেওয়া ভাল যেন তারা সৎপথে চল্‌তে সক্ষম হয়। এক পক্ষে আল্লাহ্ ও শেষ হিসাব নিকাশের দিনে বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র পথে অবিচলিত থাক্‌তে আপ্রাণ চেষ্টা এবং অন্য পক্ষে পবিত্র মস্‌জিদের ( কাবা গৃহের ) হেফাজত ও হজ্জ যাত্রীদিগকে পানি প্রদান—এতদুভয় কার্য্যকে কি তোমরা তুল্য পুণ্যজনক মনে কর? আল্লাহর নিকট এতদুভয় কাজ তুল্য নহে"। কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ ও হজ্জ যাত্রীদিগকে পানিপ্রদান— এই দুই সম্মানিত কাজ হজরত আব্বাসের উপর ন্যস্ত ছিল, কিন্তু বলা হ'চ্ছে যে এতদুভয় সম্মানিত ও পুণ্যজনক কাজ হ'লেও এরা অবিচলিত ও অদম্য বিশ্বাস ( ইমান ) ও আল্লাহ্‌র পথে আপ্রাণ চেষ্টার সহিত তুলনীয় হ'তে পারে না। উপরে যে দুইটা আয়েত অনূদিত করা হল তাহ'তে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীত হচ্ছে যে মস্‌জিদের ( কাবাগৃহের ) হেফাজত করা ও হজ্জ যাত্রীদিগকে পানি প্রদান যতই পুণ্যজনক হোক

না কেন, এরা একাকী মুক্তি আনয়ন কর্‌তে যথেষ্ট নহে; যদি তাই হয়, তবে দরগা ও মাজার নির্ম্মাণ ও তাদের সংস্কারে এবং পীর ফকিরের বার্ষিকী উপলক্ষে অজস্র অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা সম্বন্ধে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। আজ কাল্‌কার চরম অধঃপতনের দিনে মুসলমানেরা প্রকৃত উপাসনা, সাধনা ও সৎকাজের (বিশেষ ক'রে সেবার) প্রতি অবহেলা ক'রে বাহ্যিক অনুষ্ঠান ও খোসা নিয়েই ব্যস্ত। কেবল ইহাই নহে, কেহ কেহ চরমে উপনীত হ'য়েছে, তারা বাহ্যিকতার জন্যই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করে এবং সময়ে সময়ে নির্ব্বোধের মত এরূপ কাজ ক'রে বসে যাতে ভাল লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হয়।

পীর ও ফকীর—এদের চেলা ও শিষ্য আছে, এদের মধ্যে কেহ কেহ বেজায় বা উৎকট ধরণের ভক্ত। চেলাদের কাজ হচ্ছে গুরুর মহিমা কীর্ত্তন করা। এত সম্প্রদায় আছে যে গ'ণে শেষ করা দায়। শিয়া, সুন্নি, মোহাম্মদী, চিস্তি, নক্‌শাবন্দী ইত্যাদি কত নাম কর্‌ব। কিন্তু হতভাগ্য মুসলমান এত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হ'লেও যেন তা যথেষ্ট নহে, তাই পীর ও ফকিরের দল তাদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে মুসলমানের বিভিন্নতাকে চরম সীমায় উপনীত করেছে। কেবল মতের বিভিন্নতা তত দোষের বিষয় হয় না কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় যে এই মত বিভিন্নতা অশেষ অশান্তির কারণ হ'য়েছে, এই হেতু ইহাদের মধ্যে কলহ বিবাদ এমনকি মারামারীর সৃষ্টি হয়ে উহা কখন কখন আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়। এ সমস্তই গোড়ামী বা পরমত অসহিষ্ণুতার ফল বই নহে। এরূপ হওয়ার কারণ স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র মহাগ্রন্থ কোর্‌আনের সুরা রুমের ৩২ আয়েতে ও সুরা বকরের ২১৩

আয়েতে ইহাই নির্দ্দেশ করেছেন ঃ—সুরা রুমের ৩২ আয়েত ঃ—

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا - كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ -

“যারা ধর্ম্মকে বিভক্ত ক’রে সম্প্রদায় ভুক্ত হয়েছে, তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় গর্ব্ব করে যে তারা যা পেয়েছে অপরে তা পায় নাই” অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায় মনে করে যে তারাই কেবল সত্যের অধিকারী, অপরেরা ভ্রান্ত; সুতরাং তা’রা আর সকলের চেয়ে ভাল এবং অপরকে তাদের মতে আনয়ন করার অধিকার তাহাদের আছে।

এবং সুরা বকরের ২১৩ আয়েত ঃ—

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً - وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ

مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ -

“যা’দিগকে কেতাব দেওয়া হয়েছে, ঐ কেতাবে তাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রকাশ্য দলীল বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যে তা’রা মতভেদ হেতু সম্প্রদায় সৃষ্টি করে তার একমাত্র হেতু হচ্ছে তাদের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ। অন্যথা মানুষ **মাত্র এক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিল**”। সম্প্রদায় সৃষ্টি যে আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত নহে তা উপরি উক্ত সুরা-রুম এর ৩২ আয়েত ও সুরা বকরের ২১৩ আয়েত—হতে সম্যক উপলব্ধি হয়। যাঁরা প্রথমতঃ নূতন মতের সৃষ্টি করেন তাঁরা হয়ত মনে করেন যে তাঁরা স্বীয় মত সাধারণে প্রকাশ কর্‌লেন মাত্র, কেননা স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করার অধিকার সকলেরই আছে এবং তা সর্ব্বথা ন্যায় সঙ্গত,

২

বরং গোপন রাখাই ভীরুতা ও স্থল বিশেষে পাপজনক। কিন্তু পরিণামে উহা যে সম্প্রদায়ে পরিণত হ'য়ে দল সৃষ্টি কর্বে এবং অনর্থের হেতু হবে তা হয়ত তাঁরা তখন মনে কর্তে পারেন নাই। বাস্তবিক, বল্তে কি, চেলারাই সমস্ত অনর্থের কারণ, কেননা এরাই স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বা নাম ফলাইবার নিমিত্ত কতকগুলি লোককে পৃথক গণ্ডীভুক্ত করে (যেমন ব্যবসাদার পীর, ফকির)। এরা অবশ্যই নিন্দার্হ। সম্প্রদায় সৃষ্টিই যে পরিণামে দলসৃষ্টির হেতু হয় তা সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র সূরা এম্‌রানের ১০৪ আয়েতের সতর্ক বাণী দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীত হচ্ছে, ঐ আয়েতে বলা হয়েছে :—

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ـ

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *

"যারা সত্য প্রকাশ পাওয়ার পরেও নিজেদের মধ্যে বিভিন্নতা এনেছে এবং মতভেদ করেছে, তাদের দলভুক্ত হয়োনা, কেননা ঐ সকল ব্যক্তির জন্য কঠিন শাস্তি আছে।" বলা হ'ল যে সত্য প্রকাশ পাওয়ার পরে মতভেদ হওয়া উচিত নয়। ইহা আরও সুস্পষ্ট ক'রে বলে দেওয়া হয়েছে সূরা 'নহল' এর ৮৯ আয়েতে, যাতে বলা হয়েছে :—

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً

وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِينَ *

"আমি তোমার নিকট যে ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ ক'রেছি তাতে প্রত্যেকটী (দরকারী) বিষয় অতি পরিষ্কার ভাবে বিবৃত করা হ'য়েছে। উহা মুসলমানদিগের পথ প্রদর্শক, তাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ ও তাদের জন্য সুসংবাদ।" তবেই ত, ইহার পরে কি ক'রে আর ধর্ম্ম বিষয়ে মতভেদ করা যেতে পারে? এই আয়েতে স্পষ্টাক্ষরে ব'লে দেওয়া হচ্ছে যে সমুদয় দরকারী বিষয়ের জন্য পবিত্র কোর্‌আনে সুস্পষ্ট প্রত্যাদেশ আছে। অতএব তারা যে বিষয় নিয়ে মতভেদ কর্‌ছে তৎসম্বন্ধে যদি পবিত্র কোর্‌আনে প্রত্যাদেশ না থাকে, তবে বুঝ্‌তে হবে যে উহা নিশ্চয়ই অনাবশ্যক কথা, উহা অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় নহে সুতরাং উহা নিয়ে দল সৃষ্টি করা বা বিবাদ করা সমীচীন নহে। প্রথম আয়েতে অর্থাৎ উক্ত সুরা এম্‌রানের ১০৪ আয়েতে ইহাও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে তাহাদের মতভেদ বা ঝগড়া নিরর্থক, তাতে অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই, এবং সেই জন্য শাস্তির ভয় আছে, কেননা আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাদের কোন পক্ষই জানেনা যে কার ধারণা বা মত ভ্রান্তিমূলক। বাস্তবিকই যে তাদের ঝগড়া নিরর্থক তার অকাট্য প্রমাণ এই যে তারা চিরকাল বাহাস্‌ বা তর্কযুদ্ধ ক'রে আস্‌ছে অথচ এ পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে একটা মীমাংসা হ'তে পার্‌ল না। যদি সকল রকম বিবাদের মীমাংসা হ'তে পারে, তবে তাদের এই সাম্প্রদায়িক বিবাদের মীমাংসা হয় না কেন? এবং যদি মীমাংসা অসাধ্য হয়, তবে নির্ব্বোধের মত তা নিয়ে বৃথা তর্কযুদ্ধ কর্‌তে যাওয়া হয় কেন? না, কেবল তর্কযুদ্ধ নহে, এই বাহাস্‌ স্থল-বিশেষে দাঙ্গা হাঙ্গামায় পরিণত হ'য়ে মামলা মোকর্দ্দমার সৃষ্টি করে যদ্দ্বারা অর্থের শ্রাদ্ধ হয় এবং দাঙ্গাকারীর ভাগ্যে কখন কখন কারাদর্শনও

ঘটে। এস্থলে আরও দুই একটী অত্যাবশ্যক কথা মৎকৃত "হিন্দুস্থান ও মুসলমানের কোর্বানী" নামক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি। ভাল, এক্ষণে দেখা যাক যে পবিত্র মহাগ্রন্থ কোর্আন পরস্পরের প্রতি উদারতা প্রদর্শন ও পরমত সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে কি উপদেশ দেয়। আমরা সুরা আন্আমের ১০৮ ও ১০৯ আয়েতের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ কর্ছি। আল্লাহ্ উক্ত দুই আয়েতে হজরত রছুলে করিমের যোগে আমাদিগকে বল্ছেন "তোমার কাজ আমার বাণী প্রচার করা, তারা কি কর্ছে না কর্ছে তা তোমায় দেখ্তে হবেনা, দে'খে লওয়া আমার কাজ (সুরা রা'দেও এই কথা বলা হয়েছে), (এমন কি) যারা এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের পূজা করে তাদের প্রতিও কটূক্তি করোনা; কেননা, হয়ত তারা অজ্ঞতাবশতঃ বিদ্বেষপরায়ণ হ'য়ে তোমার আল্লাহ্র প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ ক'রে বস্বে। মোহবশতঃ প্রত্যেক সম্প্রদায় উহার কোন কোন মন্দ কাজকেও ভাল ভেবে ক'রে থাকে। তাদের সকলকেই তাদের মহাপ্রভুর নিকট একদিন আস্তে হবে, তখন তারা জান্তে পার্বে তারা কি ক'রেছিল"। দেখ্লে, হে মতভেদ-হেতু-বিবাদকারী মুসলমান, তোমার ধর্ম্ম কত উদার! এমন উদারতা ও পরমত সহিষ্ণুতার কথা অন্যত্র আছে কি? পুনশ্চ সুরা হজ্জের ১৭ আয়েত বল্ছে "মোস্লেম হও, ইহুদী হও, সূর্য্যোপাসক হও, খৃষ্টান হও, পুরোহিত-পূজক হও বা বহুআল্লাহবাদী অথবা অংশীবাদী হও, আল্লাহ তোমাদের সমস্তই দেখ্ছেন, কেয়ামতের দিনে তোমাদের সঙ্গে বুঝাপড়া হবে"। উদ্ধৃত আয়েত সকলের তাৎপর্য্য এই যে ধর্ম্মমতের জন্য আল্লাহ্ কাহাকেও ইহসংসারে শাস্তি দিবেন না, তবে সত্যের বিরুদ্ধতা ও

সীমা লঙ্ঘন কর্‌লে ইহজগতেও শাস্তিভোগ কর্‌তে হবে। এই নিমিত্তই এতগুলি সম্প্রদায় ও ফের্কার বিদ্যমানতা সম্ভবপর হ'য়েছে। এক্ষণে আল্লাহ্‌ই যদি ভ্রান্ত ধর্ম্মমতের জন্য ইহজগতে শাস্তি প্রদান না করেন তাহ'লে তুমি আমি শাস্তি দেওয়ার নিমিত্ত খড়্গ-হস্ত হওয়ার কে এবং ধর্ম্মমতের বিভিন্নতা হেতু পরস্পরে বিবাদ করার তোমার ও আমার অধিকার কোথায়? ভাল, তুমি আমিত কলহ বল, বিবাদ বল, চেষ্টা চরিত্র বল, কিছু কর্‌তে বাকী রাখি নাই, কিন্তু কি ফল হ'য়েছে? অনৈক্য, শত্রুতা ক'মেছে না বে'ড়েছে? আবহমান কাল তর্কযুদ্ধ বা বাহাস্‌, কলহ ও বিবাদ বা মারামারি কর্‌তে ত কসুর করি নাই, কোন মীমাংসায় উপনীত হ'তে পেরেছি কি? পরস্পরে সদ্ভাব সম্প্রীতি স্থাপিত হ'য়েছে কি? সম্প্রদায় ও ফের্কার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'তেছে না কি? তোমার ও আমার কাজ কি তাকি এখনও বুঝ্‌লে না? কেন, আল্লাহ্‌ কি উপরি উক্ত সুরা আন্‌আমের ১০৮ আয়েতে ও বহুস্থলে স্পষ্টতর বলেন নাই যে তোমার আমার কাজ হচ্ছে শান্ত ও ধীর ভাবে শিষ্টতার সহিত তাঁর বাণী প্রচার করা (সুরা নহলের ১২৫ আয়েত)? দুঃখের বিষয় এই যে অতি সত্য কথাটা আমরা ভুলে যাই যে বলপূর্ব্বক লোককে বিশ্বাসী করা যায় না, বিশ্বাস হচ্ছে অন্তরের সহিত সম্পর্কিত। ছল ও বল পূর্ব্বক সত্য বা আল্লাহ্‌র ধর্ম্মের প্রচার হয় না। সত্য প্রচার কর্‌তে হয় যুক্তি দ্বারা লোকের চিত্ত আকর্ষণ ক'রে, সত্যের জন্য সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন সহ্য ক'রে এবং মরণ পণ ক'রে অসত্যের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদে দণ্ডায়মান হ'য়ে। আরও দুঃখের বিষয় এই যে আমরা বুঝ্‌তে চেষ্টা করিনা যে তুমি আমি যার জন্য অতিমাত্রায়

উৎকণ্ঠিত হও ও হই তা অনেক স্থলেই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র ধর্ম্ম নহে, তা আমাদেরই মত মানবকৃত অনুষ্ঠান অথবা মানবের মতামত বিশেষ মাত্র। সত্যধর্ম্ম যা, আল্লাহ্‌র ধর্ম্ম যা, তা আল্লাহ্‌ই বরাবর রক্ষা ক'রে আস্‌ছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন, তজ্জন্য তোমায় আমায় অত ব্যস্ত হ'তে হবে না। আল্লাহ্‌ বল্‌ছেন "অসত্যের পক্ষপাতী যারা তারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে পর্ব্বতকে স্থানান্তরিত করতে পারে এমন শক্তি প্রয়োগ করলেও তিনি তাদের সে শক্তিকে ব্যর্থ ক'রে দেন।"—সুরা ইব্রাহিমের ৪৬ আয়েত। "আমি সত্যকে অসত্যের উপর নিক্ষেপ ক'রে সত্যের দ্বারা অসত্যের মস্তক চূর্ণ করি এবং এইরূপে অসত্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়"—সুরা আম্বিয়ার ১৮ আয়েত। "সত্য হচ্ছে উপকারী বৃক্ষ সদৃশ যা ক্রমশঃ শিকড়ে বদ্ধমূল হ'য়ে শাখা প্রশাখা বিস্তার ক'রে শক্তিশালী প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয় ও আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সময়োপযোগী ফল প্রদান করে, আর অসত্য হচ্ছে বাজে অকেজো গাছ যা মানুষ ইন্ধনের জন্য যখন তখন কেটে ফেলে।"—সুরা ইব্রাহিমের ২৪—২৬ আয়েত। অতএব অন্যের উদ্যোগ আয়োজন দেখে কাহারও অতি মাত্রায় চঞ্চল হওয়ার কারণ নাই বা নিজেদের উদ্যোগ আয়োজনের আধিক্য দর্শনে অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হওয়ারও কারণ নাই। যদি আপনারা প্রকৃত বিশ্বাসী হন তবে অন্যের প্রতি খড়্গহস্ত বা বিদ্বেষপরায়ণ না হ'য়ে ধীরতার সহিত স্বীয় বিশ্বাস প্রচার করতে থাকুন, উহা আল্লাহ্‌র মনোনীত বা অভিপ্রেত হ'লে অন্তিমে জয়যুক্ত হবেই, কিন্তু যদি তা না হয় তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারও উদ্যোগ আয়োজন তা উহা যতই শক্তিশালী ও ব্যয়বহুল হোক্ কথনই কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হবে না;

কেননা, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ভ্রান্ত মত অন্তিমে লয় প্রাপ্ত হ'তে বাধ্য—ইহাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

আমরা বল্‌ছিলাম যে চেলারাই যত অনর্থের মূল, এরাই দল সৃষ্টির প্রধান নায়ক। এরা আদৌ ভে'বে দেখেনা যে, যে বিষয় নিয়ে মতভেদ হয় তা কি প্রকৃতই এত মারাত্মক যে তার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা না হলে কোন প্রত্যবায় আছে? যেমন, সেইমত কি ইস্‌লামের মূলনীতির বিরোধী? অর্থাৎ সে মত পোষণ করলে কি কাফের বা নারকী হওয়ার সম্ভাবনা বা ভয় আছে? অথবা সেই মতাবলম্বী কি গোনাহ্‌গার বা পাপী হবে? যদি তা না হয়, তবে তা নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? সংসারে কত গুরুতর বিষয় প'ড়ে রয়েছে, সব ছে'ড়ে এর জন্য আহার নিদ্রা বিসর্জ্জন দিতে হবে কেন? আল্লাহ্ উল্লিখিত সুরা 'রুম্' এর ৩২ আয়েতে ও সুরা এম্‌রানের ১০৪ আয়েতে সম্প্রদায় ও দল সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে সতর্ক ক'রে দেওয়া সত্ত্বেও যে ঐ সকল মত বিশেষের পাণ্ডা ও দল বিশেষের চাঁইরা নিরস্ত হচ্ছে না তার কারণ বোধ হয় অনেকাংশে তাদের স্বার্থপরতা ও দুরভিসন্ধি। পূর্ব্বে বলেছি যে মতের সৃষ্টিকর্ত্তা যাঁরা তাঁরা হয়ত স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে তাঁদের প্রকাশিত মত কালে একটা সম্প্রদায় বা দল সৃষ্টি করবে, কিন্তু মতের পাণ্ডা ও দলের চাঁইরা এতই অন্ধভক্ত গোঁড়া, স্বার্থপর বা মতলববাজ যে তারা দল সৃষ্টি না ক'রে কিছুতেই স্থির থাক্‌তে পারে না। কথায় বলে যে বার হাত কুটির তের হাত বীজ। চেলারাও গুরুর চেয়ে তাঁর মতের একনিষ্ঠতা অধিক মাত্রায় প্রদর্শন করে। এরা এমন সমস্ত কথা গুরুর দোহাই

দিয়ে ব'লে থাকে, যা গুরুরা জান্‌লে মর্ম্মাহত হ'তেন। শিষ্যদের অনেকে বিশেষতঃ পাণ্ডা বা চাঁইরা যে অন্ধভক্ত ও গোঁড়া তার একটী প্রমাণ এই যে সকলেই জানে যে বিভিন্নমত তা সেগুলি যত বিভিন্নই হউক, ধর্ম্মের মূল বিষয়ের বিরোধী নহে এবং ইহাও সকলে জানে যে খুঁটীনাটী লইয়াই তাদের এই সমস্ত মতভেদ অথচ কিছুতেই তারা নিরস্ত হবে না। এই পাণ্ডা ও চাঁইরা যে স্বার্থপর ও অনেকটা মতলববাজ তাহাও একটু তলিয়ে দেখলে বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। ধরুন, এই যে বাহাস্‌ বা তর্কযুদ্ধ হয়, একটু তলিয়ে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাবেন যে উহার মূলে আছে লুক্কায়িত ভাবে স্বার্থ বা মতলববাজী। তা হচ্ছে নাম জাঁকান বা সরদারী করার ইচ্ছা এবং কে বল্‌বে যে উহা দুপয়সা রোজগারের একটা ফন্দী নহে। সহরে ও পাড়াগাঁয়ে এই সকল বিষয়ে দুই একজন ফড়্‌ফড়ী ক'রে বেড়ায় একটু সরদারী ফ'লাতে বা গুরুর প্রিয় পাত্র হ'তে, নতুবা এরা অপরের চেয়ে বেশী ধার্ম্মিক ও আল্লাহ্‌-প্রেমিক নহে বরং অনেক স্থলে ইহারা ভণ্ড ব'লে প্রতিপন্ন হ'য়ে থাকে। আমরা দে'খেছি যে যারা বাহাস্‌ করতে চায়, তা'দিগকে সাধারণের সভা সমিতিতে বাহাস্‌ না ক'রে, দুই চারিজন সম্মানিত ব্যক্তির সম্মুখে বাহাস্‌ করতে বল্‌লে তারা অস্বীকৃত হয়। আরও দে'খেছি যে এই সকল লোকের মুখেই লেগে থাকে যে কে জাহান্নামী ও কে বেহেস্তী হবে। সুরা 'বকরা' এর ১১১ আয়েতে আল্লাহ্‌ বল্‌ছেন যে 'ইহুদী ও খৃষ্টানেরা বলে যে তারাই কেবল স্বর্গবাসী হবে, কিন্তু ইহা তাদের 'মনগড়া কথা' অর্থাৎ তাহারা খেয়ালী পোলাও পাক করে বই নহে। বাস্তবিক,

যারা এই প্রকারের উক্তি করে তারা কেবল মূর্খ নহে পরন্তু তারা ধৃষ্টতাও প্রদর্শন করে, কেননা কে স্বর্গ ও নরকের বাসিন্দা হবে তা কেবল আল্লাহ্ই জানেন, মানুষ তা জানে না। অতএব যা জানা নাই সে সম্বন্ধে কথা বলা কেবল অজ্ঞতা নহে, অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা। অতঃপর আল্লাহ্ পরিষ্কার ক'রে ব'লে দিচ্ছেন তার পরবর্ত্তী আয়েতে অর্থাৎ সুরা 'বকরা' এর ১১২ আয়েতে যে কি করলে স্বর্গ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে—

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *

"স্বর্গ ও নরক নিয়ে বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা করো না, বরং যদি স্বর্গ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে চাও তবে আল্লাহে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ কর ও সৎকাজ কর"। সুরা 'নাজেয়াত' এর ৩৭-৪১ আয়েতে আরও স্পষ্ট ক'রে বলা হ'য়েছে কে স্বর্গ ও কে নরক বাসী হবে :—

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ

الْمَأْوَىٰ * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ *

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ *

"যে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে এবং পার্থিব ভোগবিলাসকে (পরকালের চেয়েও) মূল্যবান জানে, নরক তারই বাসস্থান; যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি দমন করে, স্বর্গ তারই বাসস্থান"। আসল কথা আল্লাহ্‌কে ভয় করলে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিকে ভয় করলে বা পরকালে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত শাস্তিকে ভয় ক'রে চল্‌লে নরকের ভয় থাকেনা, স্বর্গ প্রাপ্তির আশা করা যায়, কেননা পরকালে শাস্তির ভয়ই মানুষকে কুপ্রবৃত্তি দমন করায়। এরূপ স্পষ্ট আদেশবাণীর পরে আরতো বাগ্‌বিতণ্ডা করা শোভা পায় না। অতএব কাজের লোক হও, বুদ্ধিমানের মত আদেশ অনুসরণ কর। উপরের উদ্ধৃত আয়েত সকল হ'তে সপ্রমাণিত হ'ল যে ধর্ম্মবিষয়ে দল-সৃষ্টি আল্লাহ্‌র অনভিপ্রেত। সুতরাং, বল্‌তে কি, এতগুলি সম্প্রদায় ও দল সৃষ্টি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত, কেননা এগুলির সৃষ্টি তাঁর আদেশের ও তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষ দিগের উপদেশের বিরুদ্ধ কার্য্য। অথচ মানুষ এই মানব-সৃষ্ট খাম খেয়াল জিনিষ গুলির এত ভক্ত হয় কেন? মানুষ পার্থক্যের জন্য এত লালায়িত কেন? এক কথায় মানুষ মার্কা মারা হ'তে চায় কেন? হজরত রছুলে করিমের সময়েত মুসলমান কেবল মুসলমানই ছিলেন, তখন ত কেহই চিহ্নিত হ'য়ে স্বতন্ত্র দলভুক্ত হওয়ার ব্যগ্রতা প্রকাশ করতেন না। কিন্তু আজ, আজ ভারতীয় মুসলমান অপর সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বীর অধম হয়েছে তার স্বতন্ত্রতার পরিপোষকতার দরুণ; কেননা, এবিষয়ে সে সকলকে পরাস্ত করেছে। ধরুন, হিন্দু যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি ভাগে বিভক্ত, মুসলমানও তেমনি শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; হিন্দু

যেমন রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত, মুসলমানও তেমনি কোরেশী, সিদ্দীকী, দর্‌রাণী, ইউসুফজাই প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত; হিন্দুর মধ্যে যেমন মুচী, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি জল অচলনীয় সম্প্রদায় আছে, মুসলমানের মধ্যে নাদাফ (তুলা ধুননকারী), পাঝড়া (মৎস্য ব্যবসায়ী) কুঞ্জড়া (শাক সব্জী ব্যবসায়ী), মোমিন, বেদে প্রভৃতি তেমনি সমাজে অচলনীয়, ইহাদের সহিত অপর মুসলমানের বিবাহের প্রচলন নাই, একত্র আহারাদি চলে না। ঐশী মহাগ্রন্থ কোর্‌আনে কিন্তু সচ্চরিত্র ও পরোপকারীকে কুলীন এবং ব্যভিচারী ও সীমালঙ্ঘনকারীকে অস্পৃশ্য রূপে গণ্য করার বিধি আছে। সাম্যের আদর্শ ইস্‌লাম অস্পৃশ্যতার রাজ্যে এ'সে স্বীয় পবিত্রতা পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করতে সক্ষম হয় নাই, তাই ভুবন বিখ্যাত কবি হালী বড় দুঃখে ব'লেছেন যে নির্ব্বিঘ্নে সাত সমুদ্র উত্তীর্ণ হ'য়ে এ'সে ইস্‌লামের নির্ভীক নৌবহরের বান্ চাল্ হ'ল কিনা গঙ্গার মোহানায়। অস্পৃশ্যতার অন্ধঅনুকরণ যে ভারতীয় মুসলমানের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান কর্‌ছে তা তারা এখনও বুঝ্‌তে পেরেছে কি? এইত সেদিন অস্পৃশ্য জাতির নেতা ডাক্তার আম্বেদকারের দলের লোকের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের মহারথীরা স্ফীত বক্ষে প্রচার করেছেন যে মুসলমানের মধ্যেও মোমেন, বেদে প্রভৃতি অস্পৃশ্য সম্প্রদায় আছে। এরা আবার হিন্দুর চেয়ে অনেক বেশী দূর অগ্রগামী, কেননা এদের আরও অনেক কিছু আছে যা হিন্দুর নাই যেমন, শিয়া, সুন্নি, নক্‌শাবন্দী, কাদেরী, মোহাম্মদী, কাদিয়ানী, ওহাবী প্রভৃতি অনেক কিছু। তারপরে হিন্দুরা নিজের নামের শেষে বর্দ্ধমানী, বরিশালী লেখে না কিন্তু মুসলমানেরা কেবল জোনপুরী, ইস্‌লামাবাদী

লিখেই ক্ষান্ত হওয়ার পাত্র নহে, তারা জেলা ছেড়ে সহরে, সহর ছেড়ে ক্রমে গ্রামের দিকে ধাবিত হচ্ছে, এখন তারা লিখ্ছে শিরাজী (শিরাজগঞ্জী), ভাগবী (ভগবানপুরী), সৈয়দী (সৈদপুরী বা সৈয়দপুরী) ইত্যাদি। জানিনা এ ক্রমবর্দ্ধনশীল নেশার পরিণতি কোথায়? স্থরা আহ্জাবের ৫ আয়েতে আল্লাহ্ ব'লেছেন "পিতার নাম নিয়ে লোককে সম্বোধন করাই প্রশস্ত।" এক নামের একাধিক লোক থাক্বে, কাজেই বংশ পরিচয়ের আবশ্যকতা হয়। হজরত রছুলে করিম এই ভাবেই লোককে সম্বোধন কর্তেন। আমরা যে পাশ্চাত্য দেশবাসীর সর্ব্ব বিষয়ে অনুকরণ কর্তে অভ্যস্ত হ'য়েছি তাদের মধ্যেও এই প্রথাই প্রচলিত আছে। পরিচয়ের আরও স্থবিধা করার জন্য দেশের নাম লোকের নামের সঙ্গে সংযোজিত হওয়া বাঞ্ছনীয় হয়, যেমন মাক্কী, মাদিনী, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা ইদানীং আমাদের স্বভাবগত হ'য়ে দাঁড়ায়েছে, আমরা বুঝি না যে 'সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্'।

ভাল, এক্ষণে চিত্রের অপর দিকটাও একবার দেখে নিন্। আমাদের কোন এক বিশিষ্ট বন্ধু তাঁর সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতেন এই ব'লে "বৎসগণ, কেহ তোমাদের জাতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর্লে উত্তর দিও "আমরা মনুষ্য জাতি", যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমরা কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত, বলিও "আমরা মানব সম্প্রদায় ভুক্ত"। আর এক বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হয় যখন তিনি এক জিলা (হাই) স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁর নাম ছিল এক অদ্ভুত ধরণের 'আকবর মুকুন্দ গডসন'। এঁদের মানসিকতার পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। এঁদের কথা ও নামের

দ্বারাই অতি পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট হচ্ছে যে এঁদের অন্তঃকরণ কি ভীষণভাবে দগ্ধ হচ্ছিল এই স্বতন্ত্রতা-সৃষ্টি-কর্ত্তাদের কার্য্য-কলাপ-রূপ হুতাশনে। এরূপ উদার উচ্চ অন্তঃকরণের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। ইস্‌লামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ধর্ম্মজগতে অদ্বিতীয় কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় ইস্‌লাম সন্তানেরাই আজ স্বতন্ত্রতার অগ্রদূত। ঐশী মহাগ্রন্থ কোর্‌আন কিন্তু মানবজাতিকে মাত্র তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে, যথা—বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী ও কপট। অনুধাবনের বিষয় এই যে সুরা এম্‌রাণের ৬৭ ও ৬৮ আয়েতে অতি স্পষ্টভাবে বলা হ'য়েছে যে "পেট্রিয়ার্ক অর্থাৎ কুলগুরু হজরত ইব্রাহিম য়িহুদীও ছিলনা বা খৃষ্টান ও ছিল না, সে ছিল সত্যের সেবক যে, তার ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সম্পূর্ণ বিলীন ক'রে দিয়েছিল; তাহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী যারা তার পদানুসরণ করে"। ইহাতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে হজরত ইব্রাহিমের সময় পর্য্যন্ত ধর্ম্মানুসারে জাতিভেদ ছিল না; য়িহুদী ও নাছারার সৃষ্টি তাঁর সময়ের পরে। আর আজ কালত ধর্ম্ম ও শাখা-ধর্ম্মের, জাতি ও উপজাতির ছড়াছড়ি অথচ আমরা কোন সাহসে বলি যে আমরা মুসলমান ও কোর্‌আনের আদেশ পালনকারী এবং কুলগুরু হজরত ইব্রাহিমেরই আদর্শ 'ধর্ম্মাবলম্বী'। ইস্‌লাম সন্তানদের মধ্যে কি এমন উচ্চ অন্তঃকরণের লোক নাই যাঁরা নির্ভীকভাবে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা কর্‌তে পারেন যে তাঁরা কেবল মুসলমান, তাঁরা সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার উপরে? এরূপ মহাপ্রাণ ব্যক্তি কেবল মুসলমানের নহে, সমগ্র মানব জাতির পরম সুহৃদ, তাতে কোন সন্দেহ নাই। যে মানুষের, যে আল্লাহ্‌র বান্দার, সৎসাহস আছে, যাঁর আল্লাহ্ বলে

প্রকৃত ভয় আছে, তিনিই কেবল মতভেদের বিরুদ্ধে, যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে মতবিরোধ, সেখানে ঐ সমস্ত মতের সৃষ্টিকর্তারা যত বড়ই হৌন না কেন, তাঁদের অগ্রাহ্য ক'রে দৃঢ় পদে আল্লাহ্‌র ও তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষদিগের আদেশ যথাযথ পালন করতে অগ্রসর হন। এরূপ এক মহাপ্রাণ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে। ইনি হেজাজের রাজা মহাত্মা ইব্‌নে সাউদ। মক্কার হারাম শরিফের মধ্যে কাবা গৃহের চতুষ্পার্শ্বে হানাফী, শাফী, মালেকী ও হাম্বেলী চারি মজহাবের চারিটী মকাম বা ঘর আছে, পূর্ব্বে পাঁচ ওয়াক্তের প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজ উক্ত চারি সম্প্রদায় পৃথক ভাবে ( পালাক্রমে ) চারি বারে সমাধা করত যেন মুসলমান এক নহে, তার ধর্ম্মও এক নহে এবং তার আল্লাহ্‌ও এক নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহাদের এরূপ আচরণ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মানসপটে ইছ্‌লামের কি মলিন চিত্র অঙ্কিত করবে সে কথা ইহাদের অন্তঃকরণে একবারও উদিত হয় নাই। সুলতান এবনে সাউদ হেজাজের রাজা হ'য়ে এ প্রথা রহিত ক'রে দিয়েছেন, চারি মজহাবের চারি ঘর তালা চাবি দ্বারা বন্ধ ক'রে দিয়ে এবং সকল মজহাবকে এক এমামের পিছনে নামাজ পড়্‌তে বাধ্য ক'রে। উপাসনায় এখন আর ভেদ নাই, আজ কাল মক্কার হারাম শরিফ ও মদিনার রওজা শরীফ উভয় স্থানের নামাজই আল্লাহ্‌র ও তাঁর মনোনীত ধর্ম্ম ইস্‌লামের একত্ব ঘোষণা করছে। জান্‌তে পারা গেছে যে পৃথক ভাবে নামাজ পড়া রহিত করতে গিয়ে সুলতান নাকি এইরূপ যুক্তি পেষ ক'রেছিলেন আলেমমণ্ডলীর সম্মুখে যে কোরআন ও হাদিসের শিক্ষা মূলতঃ বৃহত্তর জমাতের পক্ষপাতী ও

এমাম উপযুক্ত ( যোগ্য ) হ'লে মুসলমান একে অন্যের পিছনে নামাজ পড়্‌তে অস্বীকার কর্‌তে পারে না। শিয়া, সুন্নি, প্রভৃতি দলের মত এই চারি মজহাব পরস্পরকে ভ্রান্ত মনে করে না এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবও পোষণ করে না। আমাদের মনে হয় যে চেলাদের গোঁড়ামীর দরুণই এইরূপ পৃথক নামাজ পড়ার ব্যবস্থা হ'য়ে থাক্‌বে। যাহোক, সুখের বিষয় যে তাদের আলেমমণ্ডলী সুলতান এবনে সাউদের যৌক্তিকতা স্বীকার ক'রে ইস্‌লামের গৌরব বজায় রেখেছেন।

মুসলমানের জেনে রাখা উচিত যে গোঁড়ামী জিনিষটার স্থান ইসলামে নাই এবং ইসলামের মত উদার ধর্ম্মও নাই। প্রতিমা পূজা মোস্‌লেমের নিকট ঘৃণ্য বস্তু হলেও, কোর্‌আন সুরা আন্‌আমের ১০৯ আয়েতে বল্‌ছে যে জড়োপাসকদিগের প্রতিও কটূক্তি বা তাদের দেবতাদের প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ ক'রে তাদের মনে কষ্ট দিওনা, কেননা হয়ত জিদের বশীভূত হয়ে অজ্ঞতাবশতঃ তারাও তোমার আল্লাহ্‌র প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ কর্‌তে পারে। তবে কি কর্‌বে? কোর্‌আন সুরা নহলের ১২৫ আয়েতে বল্‌ছে যে ধীর ভাবে শিষ্টতার সহিত সহানুভূতি-সূচকবাক্য প্রয়োগে সদ্‌যুক্তি দ্বারা তাদের হৃদয় আকৃষ্ট কর্‌বে। পুনশ্চ কোর্‌-আন সুরা বকরের ৬২ আয়েতে বল্‌ছে 'কোর-আনে বিশ্বাসী হও, য়িহুদী হও, খৃষ্টান হও আর জড়োপাসক হও, আল্লাহে ও পরকালে বিশ্বাস ক'রে সৎকাজ কর, তোমার ভয় নাই, তোমায় ক্ষুব্ধ হতে হবে না, তোমার মহাপ্রভু তোমায় পুরস্কৃত কর্‌বেন' অর্থাৎ যদি মোক্ষ চাও মানবের স্বভাবধর্ম্মে বিশ্বাসী হও, এক কথায় আল্লাহে আত্ম-সমর্পণ কর বা তোমার ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সম্পূর্ণ

বিলীন কর। যে ধাতু হতে ইস্‌লাম ও মোসলেম শব্দের উৎপত্তি সেই আস্‌লাম ধাতুর অর্থই আত্ম-সমর্পণ, সুতরাং হিন্দু, জৈন, য়িহুদী, খৃষ্টান সকলেই আল্লাহে আত্ম-সমর্পণ কর্‌লে আপনাদিগকে মোস্‌লেম বল্‌তে পারে এবং আল্লাহে আত্ম-সমর্পণ করতে পার্‌লে কে না আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে কর্‌বে? দেখলেন ইস্‌লাম কত উদার!

উপযুক্ত ভাবব্যঞ্জক শব্দের অভাবে আমরা মুসলমানদের বেলাও সম্প্রদায় শব্দ ব্যবহার করেছি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর বেলায় Sect বা সম্প্রদায় বল্‌তে যা বুঝায় মুসলমানদিগের বেলা তা বুঝায় না; কেননা, ইহারা ব্যক্তিবিশেষের মতের অনুগামী হলেও ধর্ম্মের মূলনীতি ( Fundamental Principles ) ইহাদের সকলেরই এক বা ইহাদের ইমানে কোন পার্থক্য নাই। বল্‌তে কি, ইহারা যাঁদের মতের অনুগামী—তাঁরা যত বড় বিদ্বান, যত বড় জ্ঞানীই হউন না কেন, আল্লাহ্‌র ভয় তাঁদের অন্তরে থাক্‌লে তাঁরা কোন কালেও মূলনীতি-বিরোধী কথা মুখে আন্‌তে সাহসী হতে পারেন না। এমন কি উপরে যে মজ্‌হাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে, উহারাও মূলনীতির বিরোধী নহে, উহারা মুসলমান দার্শনিক দিগের চুলচেরা বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং ইমানে কোন ইতর বিশেষ করে না, অন্ততঃ সহী বোখারী শরিফের কেতাবুল্ ইমান পাঠে ত মনে এইরূপ ধারণাই জন্মে। কাজেই ইহাই প্রতীত হচ্ছে যে এই সকল মতানৈক্য মূল বিষয়ে নহে, বাজে বা অপ্রধান বিষয় নিয়ে। কিন্তু মতানৈক্য যেমনই হোক্, দলসৃষ্টি নিশ্চয়ই দূষণীয়, কেননা দলসৃষ্টির প্রধান হেতু হচ্ছে বিদ্বেষ ও গোঁড়ামী।

আপনারা কি কখনও শিয়া ও সুন্নি, হানাফী ও মোহাম্মদীকে পরস্পর সম্ভাষণ বা আদর আপ্যায়ন কর্‌তে দেখেছেন? এ দৃশ্যকে উপভোগ-যোগ্য করার জন্য এদের সঙ্গে বিভিন্ন পীর ও ফকিরের শিষ্য দিগকেও সামিল ক'রে দিন। এখন দেখুন দেখি কেমন সন্দিগ্ধতা ও হিংসাভাব-পূর্ণ নয়নে তারা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌ছে। এক্ষণে এই সমস্ত বিজাতীয় ভাবাপন্ন লোকদিগের মানসিকতা পরীক্ষার জন্য একবার এদের সহিত মিলিত হউন, আপনাদের মনে হবে যে আপনারা এমন সমস্ত লোকের মধ্যে এসে পড়েছেন যাদের মধ্যে ইস্‌লামিক ভাবের লেশ মাত্রও নাই। ভবিষ্যদ্দর্শী সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ্‌ পবিত্র কোর্‌আনে এ সকল লোক সম্বন্ধে বলেছেন যে "যারা ধর্ম্মকে বিভক্ত ক'রে সম্প্রদায় ভুক্ত হয়েছে তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় গর্ব্ব করে যে তারা যা পেয়েছে অপর সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা তা পায় নাই।" বাস্তবিক, বল্‌তে কি, প্রত্যেক সম্প্রদায় মনে করে যে তারাই কেবল ঠিক পথে আছে, অপর সকলেই ভ্রান্ত এবং এই প্রকারের ধারণাই হচ্ছে যত সাম্প্রদায়িক শত্রুতা ও বিবাদের মূল। কে বল্‌বে যে ইস্‌লামিক ভ্রাতৃভাব কোথায় চলে গেল? এবং এ শোচনীয় পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী কে? পরম করুণাময় কৃপাসিন্ধু আল্লাহ্‌ পবিত্র কোর্‌আনের সুরা 'এম্‌রান'এর ১০২,১০৩ ও ১০৫ আয়েতে সস্নেহ ভৎর্সনা ক'রে উপদেশ দিয়েছেন:—

يايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقته و لا تموتن الا و انتم مسلمون *

واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا - واذكروا نعمت الله عليكم اذ

كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا (ج) ولا

تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء هم البينت (ط) واولئك

لهم عذاب عظيم *

"হে বিশ্বাসি-গণ, আন্তরিকতার সহিত প্রকৃতভাবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহাতে সম্পূর্ণ ভাবে নিমজ্জিত হও, সকলে সমবেত ভাবে তাঁর রজ্জু দৃঢ় আকর্ষণ কর, মত ভেদ করোনা এবং তাঁর অনুগ্রহের কথা মনে কর; কেননা, তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণ এক ক'রে দিয়েছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছ। এবং যারা সত্য প্রকাশ পাওয়ার পরেও নিজেদের মধ্যে বিভিন্নতা এনেছে এবং মতভেদ করেছে, তাদের দলভুক্ত হয়োনা; কেননা ঐ সকল লোকের জন্য কঠিন শাস্তি আছে।" উপরে উক্ত আয়েতসমূহে আল্লাহ্ মদিনা শরিফের দৃষ্টান্ত দিয়া বিশ্বাসীদিগকে পৃথিবীরূপ বৃহত্তম মদিনায় ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে ইঙ্গিত করেছেন ও মতভেদের পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক ক'রে দিয়াছেন। এবং তিনি সুরা 'আন্‌ফাল' এর ৪৬ আয়েতে সতর্ক ক'রে দিয়াছেন এই ব'লে :—

واطيعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم

"এবং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর পয়গাম্বরের আদেশ মত চলো, বৃথা বাদানুবাদ করো না—অন্যথা তোমাদের পতন হবে এবং তোমরা সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত হবে।" আল্লাহ্র উক্ত আদেশ অবহেলার জন্যই কি মুসলমান বর্ত্তমানে যত পার্থিব লাঞ্ছনা ও দুর্গতি ভোগ কর্‌ছে না? কেবল সাধারণ মুসলমান নহে, তাদের এই পীর ফকিরেরাও এর জন্য কম দায়ী নহেন। আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ ক'রে উপসংহারে এই পীর ও ফকিরদের সম্বন্ধে বিস্তৃত মন্তব্য প্রকাশ কর্‌ব। আমরা আশাকরি যে সকলে আমাদের বক্তব্যের সহিত আমাদের মন্তব্য পাঠ ক'রে তাঁদের স্বীয় মতামত স্থির কর্‌বেন। আমরা বলি এই সকল পীর ও ফকির সাধারণের যে উপকার করেন তার চেয়ে অপকার কম করেন না। ভাল, একবার লাভালাভের খতিয়ান করেই দেখা যাক্। তাঁরা যে তাঁহাদের কতকগুলি শিষ্যের প্রভূত মঙ্গল সাধন করেন তাহা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অতীব অল্প, এমনকি যে সকল শিষ্য অযত্নে ও অবহেলায় সময় ও জীবন নষ্ট করে তাদের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। একথা অবাধে বলা চলে যে এই সমস্ত পীর ও ফকির মুসলমানের মধ্যে সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধির সহায়তা করেন যা ইসলামের কলঙ্ক বিশেষ। ইঁহারাই পুরোহিত সৃষ্টির প্রধান কারণ স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়েছেন, যাঁদের উপরে তাঁদের অধিকাংশ শিষ্য আল্লাহ্কে ভুলে নির্ভর কর্‌তে শিখেছে। আমরা

এই সকল মুরিদানের মনোযোগ আকর্ষণ করছি পবিত্র কোরআনের সুরা 'জোমর' এর ৩ আয়েতে, যাতে বলা হয়েছে যে 'তাবেদারী একমাত্র আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, তবে যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে মুরব্বী ধরে এই মনে ক'রে যে উহারা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র নিকট পৌছায়ে দিবে, তাদের বিচার আল্লাহ্‌ করবেন'; সুরা 'তওবার' ৩১ আয়েতে, যাতে বলা হয়েছে যে "ইহুদীও খৃষ্টানেরা তাদের ধর্ম্মযাজক ও সাধুমহাপুরুষদিগকে দেবতার আসনে বসায়েছে" ও সুরা ইউসুফের ১০৬ আয়েতে, যাতে বলা হয়েছে যে "যদিও তারা মুখে বলে কিন্তু তারা আল্লাহে বিশ্বাসী নহে, তারা অংশীবাদী।" আল্লাহ্‌ চাহেত উপসংহারে আমরা এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করব। আমরা বলছিলাম যে এই পুরোহিতদের উপর অধিকাংশ শিষ্য আল্লাহ্‌কে ভুলে নির্ভর করতে শিখেছে। এই পুরোহিত বা মধ্যস্থ ব্যক্তিদের উপরে নির্ভরতা তাদের উন্নতির অন্তরায় হয়ে তাহাদিগকে অবনতির দিকে নিয়ে চলেছে; কেননা, আত্মচেষ্টা যা সব উন্নতির মূল তা তারা ছেড়ে দিয়েছে। মানুষ অলসতা প্রিয়, তারা সহজ ছেড়ে কঠিনের দিকে যেতে চায় না। যাঁরা এটা হৃদয়ঙ্গম না করতে পেরে, লোকের আত্মচেষ্টার পথে যা বাধা উপস্থিত করে এমন সমস্ত কার্য্যের অবতারণা করেন, তাঁরা কেবল এ সমস্ত লোকের নহে অজ্ঞাতে সমস্ত মানব সমাজের সহিত শত্রুতা করেন। এই সমস্ত সাদাসিধে ধরণের লোকে না বুঝতে পেরে এমন বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ ক'রে বসে যা শির্ক বা অংশীবাদের কাছাকাছি এসে পড়ে। এই জন্যই বোধহয় করুণাময় সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয় বান্দাদিগকে সতর্ক ক'রে

দিয়েছেন সুরা তওবার ৩৪ আয়েতে যে 'ব্যবসাদার পীর ও ফকিরের অধিকাংশ তাহাদিগকে ঠকায়ে অর্থগ্রহণ করে ও তাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে যেতে বাধা প্রদান করে'। ঐ আয়েত বল্‌ছে :—

يا يها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليا كلون اموال

الناس بالباطل و يصدون عن سبيل الله (ط) -

আল্লাহ্‌র এই সতর্ক বাণী নিশ্চয়ই বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। পীর ও ফকিরের উপর নির্ভর করার ফল এই হয় যে তারা নিজেও চেষ্টা করেনা, তাদের গুরুরাও আল্লাহ্‌র পথে চলার জন্য কোন সহায়তা তাদেরকে করেননা, অবস্থা যা হয়ে দাঁড়ায় তা চিন্তা কর্‌লে ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। পবিত্রতা অর্জ্জনের চেষ্টা ব'লে কোন কথা ( قد افلح من زكها —সুরা শাম্‌স্‌' এর ৯ আয়েত ) তাদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। চরিত্রের উন্নতি বা আত্মোৎকর্ষ সাধন ব'লে কোন কথাই তাদের অভিধানে নাই—সুরা নজমের ৩৯ আয়েত। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও সকলে সমাধা করেনা, কেহ কেহ নামাজই পড়েনা তবে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাদের গুরু প্রদত্ত মন্ত্র ( মন্ত্র এইজন্য বলি যে তারা তার বিন্দু বিসর্গ বুঝেনা ) আওড়ায়ে থাকে বটে, কিন্তু বেহেস্ত যে তাদের জন্য ঠিক হয়ে আছে সে বিশ্বাস অনেকেই রাখে। এইত অবস্থা, কিন্তু ঘটনা ক্রমে কেহ এই সমস্ত মুধ্যস্থ ব্যক্তিদের

আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ কর্‌লে তারা খড়্গাহস্ত হয়ে উঠে; এবং তাদের বাঁধাবুলি (যুক্তি) আওড়াতে থাকে, যথা—সংসারের সকল কাজে সাহায্যকারীর দরকার হয়, যেমন দরবারে যেতে প্রবেশাধিকার জ্ঞাপক কার্ডের দরকার, জমিদার সেরেস্তায় মণ্ডলের দরকার, থানায় বা উকিল মোক্তারের নিকট যেতে দেউনিয়া না হ'লে চলেনা, হাকিমের কাছে উকিল মোক্তার নিয়ে যেতে হয়, তবে কি সর্ব্বশক্তিমান মহাবিচারকের কাছে বিনা অছিলায় যাওয়া চল্‌বে? কি মহা ভ্রমাত্মক ও সর্ব্বনাশকর বিশ্বাস! এই প্রকারের বিশ্বাসই অতি সুন্দর ও অতি মজবুত ইস্‌লাম-সৌধের ভিত্তি অলক্ষ্যে ধ্বসিয়ে ফেল্‌বার যোগাড় কর্‌ছে।

কেবল সাধারণ অশিক্ষিত লোক নহে, অনেক শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিও এইরূপ ধারণা পোষণ করেন। তাঁদের ধারণা এই যে আল্লাহ্‌ও এই দুনিয়ার আদালতের বিচারকদের মত এজলাসে ব'সে বিচার কর্‌বেন, সাক্ষ্য সাবুদ নেবেন, যুক্তি অজুহাত শুন্‌বেন, ছহি সুপারেশ গ্রহণ কর্‌বেন, সুতরাং আল্লাহ্‌র নিকট যেতে একজন পক্ষ সমর্থক অপরিহার্য্য রূপে দরকার। এরূপ ধারণা কেবল ভ্রমাত্মক নহে অধিকন্তু জঘন্য ও অপবিত্র ভাবপূর্ণ ও আল্লাহ্‌র অপমানসূচক। তাঁরা কি জানেননা যে আল্লাহ সর্ব্বান্তর্য্যামী * إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, তিনি কেবল আমাদের কার্য্যকলাপ নহে, অন্তরের কল্পনাও পরিজ্ঞাত, সুতরাং তাঁর জন্য সাক্ষী সাবুদ উকিল মোক্তার দরকার হবে কেন? তিনি কি সুরা মরিয়মের

৯৬ আয়েতে বলেন নাই যে "কেয়ামতের দিনে তাদিগকে একাকী তাঁর নিকট উপস্থিত হ'তে হবে?" (অর্থাৎ কেহই পক্ষসমর্থনকারীকে সঙ্গে আন্‌তে পার্‌বেনা)—"وكلهم اتيه يوم القيمة فردا"। এই তীক্ষ্ণধীরা দুনিয়া জাহানের সব কিছু জেনে রাখ্‌তে পারেন, পারেন না কেবল আল্লাহ্‌র বাণী জেনে রাখ্‌তে। আরবের লোকেরাও বিশ্বাস কর্‌ত যে তারা দেবতার পূজা করে এই জন্য যে তারা উহাদিগকে আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছিয়ে দিবে (সুরা জোমরের ৩ আয়েত দ্রষ্টব্য) এবং প্রকাশ্যে বল্‌ত যে তাদের দেবতারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ কর্‌তে তাদিগকে সহায়তা করবে ব'লে তারা উহাদের তাবেদারী করে। আল্লাহ্ ঐধারণার মূলোৎপাটন করার জন্য প্রতিবাদ করেছেন পবিত্র কোর্‌আনের অনেক আয়েতে যথা—সুরা আন্‌আমের ৫১ আয়েতে, সুরা এন্‌ফেতরের ১৯ আয়েতে, সুরা দোখানের ৪১ আয়েতে, সুরা 'বকর' এর ৪৭ আয়েতে, সুরা তারেকের ১০ আয়েতে ইত্যাদি। আমরা নমুনা স্বরূপে এখানে কেবল একটী আয়েত অর্থাৎ শেষোক্ত সুরার ১০ আয়েতেরই ব্যাখ্যা কর্‌ছি—

فما له من قوة ولا ناصر *

"(সেদিন) তার (মানুষের) কোন কিছু করার শক্তি বা তার কোন সহায় থাক্‌বেনা"—অর্থাৎ দুনিয়ায় যেমন সে সত্যকে গোপন ক'রে, মিথ্যার জাল বিস্তার ক'রে, অর্থের সাহায্যে লোক্‌কে হাত ক'রে,

যুক্তি তর্ক অজুহাত দেখায়ে এবং বন্ধু বান্ধব ও মুরব্বীর সুপারেশে শাস্তির হাত হ'তে অব্যাহতি পেয়ে থাকে, কেয়ামতের দিনে তা হবেনা অর্থাৎ সেদিন আদালত বস্‌বেনা, বিচারক থাক্‌বে না, পক্ষ বা আসামী ফরিয়াদী বা বাদী প্রতিবাদী ব'লে কোন পদার্থই থাক্‌বেনা, সেদিন হচ্ছে কর্ম্মফল পরীক্ষার দিন, সকলে নিজ নিজ কর্ম্ম ফলের জন্য উদগ্রীব বা সন্ত্রস্ত থাক্‌বে এবং তাদের প্রভু তাদের কর্ম্মফল পরীক্ষা কর্‌বেন। সে পরীক্ষা ঠিক এই দুনিয়ার কোন পরীক্ষার মত নহে, কেননা সেদিন মানুষের কথা বলার অধিকার থাক্‌বেনা—সে কেবল দেখ্‌বে ও শুন্‌বে, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যার সাহায্যে সেকার্য্য করেছিল তারাই সেদিন কথা ব'লে সাক্ষ্য প্রদান কর্‌বে, এবং তার কার্য্যকলাপকে আকার ধারণ করায়ে তার সম্মুখে প্রকটমান করা হবে, এক কথায় সিনেমায় তার কার্য্যকলাপ প্রদর্শন করা হবে এবং সে হতভম্ব হয়ে কেবল দেখ্‌তে থাক্‌বে। আল্লাহ্ যে একথা পুনঃ পুনঃ তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কোর্‌আনে বলেছেন তীক্ষ্ণধীরা কি তা জানেন না, না তাঁরা এটাকে অবিশ্বাস্য মনে করেন? দুই একটা দৃষ্টান্তই না হয় দেওয়া যাক—

هذا يوم لا ينطقون (لا) ولا يؤذن لهم فيعتذرون -

সুরা মোর্‌সেলাতের ৩৫ ও ৩৬ আয়েত, "ঐ দিন তারা কথা বল্‌তে পার্‌বেনা, এবং তাদিগকে আপত্তি দেখাতেও অনুমতি দেওয়া হবে না."।

اليوم نختم على افواههم و تكلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم

بما كانوا يكسبون ❋

—সুরা ইয়াসিনের ৬৪ আয়েত,

"সেদিন আমি তাদের মুখ বন্ধ ক'রে দিব, তারা যা করেছে তাদের হাতে বল্‌বে, তাদের পা সাক্ষ্য দিবে"।

يومئذ يصدر الناس اشتاتا (لا) ليروا اعمالهم (ط)

—সুরা জিল্ জালের ৬ আয়েত,

"সেদিন মানুষকে দলে দলে বিভক্ত করা হবে যেন তারা তাদের কৃত কার্য্যসকল দেখ্‌তে পায়"। অর্থাৎ তাদের কার্য্যসকল তাদের সম্মুখে প্রকটমান করা হবে (যেমন সিনেমায় করা হয়)। ইহাত তীক্ষ্ণধীরা অবিশ্বাস কর্‌তে পারেন না; কেননা, মানুষ আল্লাহ্‌র কণা মাত্র জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে যদি গ্রামোফোনের মত একটা অচেতন পদার্থ দ্বারা কথা বলাতে পারে, গান করাতে পারে, বক্তৃতা দেওয়াতে পারে, কোন্ কালে কি ঘটনা ঘটেছিল তা যদি সে সিনেমায় বা সবাক্ চলচ্চিত্রের দ্বারা যখন তখন হুবহু দেখাতে পারে, তবে কি তার সৃষ্টি কর্ত্তা অনন্ত-জ্ঞান ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্ মানুষের কার্য্যকলাপকে আকার ধারণ করায়ে প্রকটমান কর্‌তে ও হস্তপদাদি দ্বারা কথা বলাতে পারেন না?

আমাদের মনে হয় যত গোল বেধেছে সুরা ফাতেহার 'মালেকে-ইয়াওমোদ্দিন' কথা নিয়ে। মালেকে ইয়াওমেদ্দিনের ভুল অর্থ করা হয় "শেষ দিনের বিচারক" অর্থ ক'রে। এখানে মালেক শব্দের 'মিম্' এর উপর খাড়া জবর' আছে, এইরূপ খাড়া জবর থাক্‌লে মালেকের অর্থ 'প্রভু' হয়, রাজা বা বিচারক অর্থ হয় না। প্রভু অর্থে মালেকে ইয়াও-মেদ্দিন যে কি গভীর ভাব প্রকাশ করে, রাশীকৃত শব্দের যোজনা দ্বারাও মানুষের তা ব্যক্ত করার সাধ্য নাই। কেয়ামতের কথা মনে উদিত হইলেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়. এমতাবস্থায় কেয়ামতের দিনের মালিকের ক্ষমাশীলতার কথা যাতে মনে উদ্রেক হয় এমন কোন কথা স্মরণে মনে কি ভাবের উদ্রেক হতে পারে তাহা চিন্তা ক'রে দেখার বিষয়, প্রভু শব্দ তাহাই স্মরণ করায়ে দেয়। ইহাই ইয়াওমেদ্দিনের সহিত 'খাড়াজবর' বিশিষ্ট মালেক শব্দের ব্যবহারের সার্থকতা। কৃপাসিন্ধু আল্লাহ্ পরকালের শাস্তির প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বান্দা দিগকে ব'লে দিলেন যে তিনি বিচারক নহেন, তিনি শেষ দিনের প্রভু ; কেননা, বিচারকের ক্ষমা করার অধিকার নাই, প্রভুর ক্ষমা করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। "যত পাপই ক'রে থাক আমার কৃপা হতে হতাশ হয়োনা, তওবা ক'রে ক্ষমা চাও, কেননা তোমাদের প্রভু সমস্ত গুনাহ্ মার্জ্জনা করতে সমর্থ"। ইহার সহিত সুরা জোমরের ৫৩ আয়েত ও সুরা মোজ্জাম্মেলের শেষ আয়তের তুলনা করুন। কি দয়া, কি ভালবাসা ! মালেকে ইয়াওমেদ্দিন শব্দে যেন দয়া ও ভালবাসা উছলিয়ে পড়্‌ছে! বাস্তবিকই, হে আল্লাহ্ তুমি রহ্‌মানুর্ রহিম্।

সুরা ফাতেহা সমস্ত কোর্‌আনের নির্যাস এবং ইহা উপাসনার

আদর্শ। উপাস্যের প্রকৃত স্বরূপের ধারণা না করতে পারলে উপাসনা ব্যর্থ। তাই আল্লাহ্ এই সুরায় স্বীয় প্রকৃত স্বরূপের সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন এবং সূচনাতেই "আল্ হাম্‌দো লিল্লাহ্" বা 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই' ব'লে উহার যথাযথ ভাব প্রকাশ করেছেন; কেননা, ইহার অর্থ এই যে যা কিছু গৌরবের, যা কিছু সৎ, যা কিছু ভাল তা আল্লাহ্‌র, এতে তাঁর কেহ শরিক্ বা অংশীদার নাই। এবং যাতে তাঁর বান্দারা ইহা যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তজ্জন্য তাঁর প্রধানতম চারিটী গুণের উল্লেখ ক'রে তৎ সম্বন্ধে বিশেষ অনুধাবন করতে বলেছেন, কেননা এই চারি প্রধানতম গুণ, যথা (১) রব্ (২) রহ্‌মান (৩) রহিম্ (৪) মালেক— তাঁর স্বরূপের দ্যোতক এবং এদের বিষয়ে গভীর আলোচনাই হচ্ছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ বা তাঁর উপাসনা। উপরে মালেক শব্দের সামান্য একটু ব্যাখ্যা করা হ'ল, সমস্ত গুণের যথাযথ ব্যাখ্যা করা এক তুমুল ও বৃহৎ ব্যাপার, পরন্তু ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয়ও নহে। যাঁরা এ সম্বন্ধে বেশী জানতে চান তাঁরা মৎকৃত কোর্‌আন প্রবেশিকায় সুরা ফাতেহার টীকা দেখুন। অতএব আমরা এখানেই ইতি ক'রে আলোচ্য বিষয়ে প্রত্যাবৃত্ত হচ্ছি।

আমরা যে সকল পীর ও ফকিরের সম্বন্ধে বল্‌ছিলাম তাঁদের শিষ্য-দিগের একভাগ—অধিকাংশ শিষ্যই এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত—তাদের জীবদ্দশায় দ্বিতীয়বার গুরুদর্শন লাভ ক'রে তাদের পোড়া অদৃষ্টের কথা বলার সুযোগ প্রায় পায়না। মৃত্যুর সময়ে ভ্রান্ত বিশ্বাসে ও বৃথা আশায় তাদের মনকে তারা এইব'লে প্রবোধ দেয় যে গুরু তাদের আত্মার সদ্গতি ক'রে দেবেনই। শিষ্যদের আর একভাগ—এভাগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত

অনেক অল্প—বৎসরান্তে একবার বার্ষিক উস এর সময়ে গুরুদর্শন লাভে তাদের আধ্যাত্মিক বুভুক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করে। এঁদের শিষ্যদিগের মধ্যে কতকগুলি সৌভাগ্যবান পুরুষও আছেন, যাঁরা কিছু দোওয়া বা মন্ত্র শিক্ষা ক'রে গ্রামে ছোটখাট দেবতা হয়ে বসেন। এই শিষ্যদের কেহ কেহ কোন দোওয়া বা মন্ত্র এত দ্রুত আওড়াতে থাকেন যে তাঁদের নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসে এবং এরূপ করতে করতে তাঁরা অজ্ঞান হয়ে পড়েন, যেমন কীর্ত্তন করতে করতে কোন কোন হিন্দুভক্ত দশা প্রাপ্ত হন। সাধারণ লোকের নিকট এঁদের ধার্ম্মিক বা সাধু ব'লে প্রতিপত্তি আছে। আবার কেহ কেহ দোওয়া বা মন্ত্র বলে অনেক সাধনার পরে জিন বশীভূত করেন, যারা (যে জিনেরা) এঁদের আদেশমত মিঠাই, সন্দেশ বা অন্য দ্রব্য সংগ্রহ ক'রে দেয় বা এই ধরণের কাজ ক'রে দেয়। **মুক্তির জন্য যে আত্মার বিশুদ্ধীকরণ একান্ত অপরিহার্য্য ইহা এইসমস্ত লোকের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।** প্রসঙ্গক্রমে এখানে 'সাধক' ও 'সিদ্ধি' বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা আমরা একান্ত বাঞ্ছনীয় মনে করি। সাধকের সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা বড়ই ভ্রমাত্মক। তাহারা কাহারও মধ্যে একটু তন্ময়তার ভাব বা একটু অদ্ভুত কার্য্য করার শক্তি দেখলেই মনে করে যে ঐ ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করেছেন, আর অমনি তাঁর প্রতি তাদের ভক্তির ভাব উছলিয়া পড়ে। কেহ হয়তো 'ছিল্লা' গ্রহণ করেছেন নির্জ্জন স্থানে বা নির্জ্জন গৃহে বা নিভৃত কক্ষে ব'সে ধ্যান আরম্ভ করেছেন এবং ঐ উপায়ে একটু তন্ময়তা লাভ করেছেন, অমনি সে কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হ'ল, আর অমনি তাঁকে সিদ্ধ পুরুষ মধ্যে পরিগণিত করা হ'ল। কেহ হয়ত বিশেষ

উপায় অবলম্বন ক'রে অন্তঃকরণের শক্তির উৎকর্ষতা লাভ অথবা দর্শন বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তির উন্নতি সাধন করেছেন যদ্ধেতু তিনি ব'লে দিতে পারেন কোথায় কি হচ্ছেঃ ধরুন, কেহ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছে এটা তিনি তাঁর অর্জ্জিত শক্তি বলে পূর্ব্বেই টের পেলেন এবং তা প্রকাশ ক'রে ফেল্লেন, অমনি তাঁর সিদ্ধি লাভের কথা সর্ব্বত্র বিঘোষিত হ'ল এবং তাঁকে তখনই সিদ্ধ পুরুষের আসন প্রদান করা হ'ল। এরূপেও অনেকে পীর হয়ে থাকেন। নিজ চক্ষে যা দেখেছি এবং বিশ্বস্ত সূত্রে যা শুনেছি তারই দুই একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—ভারতবর্ষে যে সমস্ত গণিত শাস্ত্রবিদ পদার্পণ করেছেন তন্মধ্যে সুপরিচিত স্বনামধন্য ডাক্তার বুথ কিছু কালের জন্য হুগলী কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তাঁকে কখন কখন তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষের এক কোণে দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে ব'সে থাকতে দেখা গিয়াছে। এই ভাবে তিনি জটিল বিষয়ের সমাধানের জন্য এত তন্ময় হয়ে যেতেন যে তাঁর বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যেত—ইনিও কি একজন সিদ্ধ পুরুষ? আরও দুই একজনের কথা শুনেছি যে তাঁদের গাত্র ধ'রে ঝাঁকি না দিলে তাঁদের চৈতন্যলাভ হতনা—এঁরাও কি সিদ্ধ পুরুষ? লোককে মিস্‌মেরিজ্‌ম্ ক'রে তাদের দ্বারা অনেক কথা বলান হয়েছে। এও শুনেছি যে এমন লোকও আছেন যাঁরা কেহ কাগজের মধ্যে কোন প্রশ্ন লিখে বাক্সে বন্ধ ক'রে রাখলে, সেখানে উপস্থিত না থেকেও ঐ কাগজে উত্তর লিখে দিতে পারেন অর্থাৎ তাঁদের অনুপস্থিতিতে কোন প্রশ্ন কাগজে লিখে বাক্সে বন্ধ ক'রে রে'খে কিছুক্ষণ পরে খু'লে দেখলে ঐ কাগজে যথাযথ উত্তর লিখিত হয়ে রয়েছে দেখতে পাওয়া যাবে—এঁরাও কি সিদ্ধ পুরুষ? কীর্ত্তনওয়ালা হতে এই

শেষ পর্য্যন্ত যে সমস্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল এঁদের কাহারও পন্থা সিদ্ধির পন্থা নহে, সিদ্ধির পন্থা হচ্ছে সর্ব্বথা শুদ্ধবুদ্ধ হয়ে আল্লাহে আত্ম সমর্পণ।

এক্ষণে যারা মুসলমান তারা সকলেই জানে বা শুনেছে যে লায়লাতেল কদর বা শবে কদর কোন্ রাত্রি এবং তার মাহাত্ম্য কি? পবিত্র ঐশীগ্রন্থ কোর্‌আন বল্‌ছে "লায়লাতেল কদর সহস্রমাস অপেক্ষাও উত্তম, ঐ রাত্রে ফেরেস্তা ও রুহ্ অবতীর্ণ হয়—উহা কল্যাণ ও শান্তির রজনী।" অধিকাংশ মুসলমান মহাপুরুষের মতে উহা রমজান মাসের ২৭সে রাত্রি—যে রাত্রে দিব্য দৃষ্টি লাভের আশায় কত আল্লাহ্—প্রেম—পিপাসু মুসলমান নরনারী এবাদৎ ও জিক্‌রে এলাহিতে সমস্ত রজনী অতিবাহিত করেন। কোন কোন বিজ্ঞ মহাপুরুষের মতে রমজান মাসেই সিদ্ধিলাভের অধিক সম্ভাবনা থাক্‌লেও, ঐ আবেদের ও সাধকের পক্ষে সেই রাত্রিই তাঁর লায়লাতেল কদর যে রাত্রিতে তাঁর এবাদৎ ও রেয়াজৎ, সাধনা ও তপস্যা অভিপ্সিত সিদ্ধিলাভ করে, যে রাত্রে তাঁর হৃদয় দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়, দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়, আল্লাহ্‌র নূরে সমস্ত জগত উদ্ভাসিত হয়, ফেরেস্তা বা প্রেরণা যা কিছু সবই তাঁর নিকট প্রেরিত হয়, স্বর্গ ও মর্ত্তের কিছুই আর তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে থাকেনা। হজরত সেখ সাদি প্রভৃতি মহাপুরুষেরা বলেন যে আবার এই রাত্রিতেই তাঁর সমস্ত বিষয়-কামনা, এমন কি সম্মান প্রতিপত্তি লাভেচ্ছা সবই অন্তর্হিত হয় এবং তিনি নিষ্কাম ও স্বল্পবাক্ হয়ে দুনিয়ায় অবস্থান করেন। এই বৃত্তান্ত হতে বেশ বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে যে সিদ্ধি কাহার নাম এবং সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকের পরিচয় কি? সিদ্ধির ক্রমোন্নতির লক্ষণ এই যে বিষয়-কামনা ততই হ্রাস প্রাপ্ত হতে থাকে, সাধক যতই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে থাকেন। অতঃপর বক্তব্য বিষয়ে

প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্। আমাদের মনে হয় যে এই সমস্ত পীর ও ফকিরের অধিকাংশই তাঁদের শিষ্যদিগের অজ্ঞতা ও বিনা বিচারে তাঁদের কথা মেনে লওয়ার দরুণ অনেকটা সুবিধা ক'রে নিতে পেরেছেন। পবিত্র কোর্‌আনের সুরা 'মায়দার' ৩৬ আয়েতে আল্লাহ্ বলেছেন—

يا يها الذين امنوا اتقوا الله و ابتغوا اليه الوسيلة و جاهدوا فى سبيلة لعلكم تفلحون -

"হে বিশ্বাসিগণ' আল্লাহ্‌কে ভয় কর, এবং তাঁর নিকটে উপনীত হওয়ার জন্য "অছিলা" অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে অবিচলিত থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা কর যেন তোমারা সৌভাগ্য লাভ কর্‌তে পার।" এই আয়েতের অছিলা শব্দই হচ্ছে পীর দিগের একমাত্র সম্বল অছিলার আভিধানিক অর্থ 'জারিয়া' বা 'সহায়তা'. তা একাধিক প্রকারে হতে পারে; 'নৈকট্য লাভের উপায়' এ অর্থ কর্‌লে বোধহয় ভাবটা সুন্দর প্রকাশ পায়। আল্লামা ইউসুফ আলি সাহেব তাঁর কোর্‌আনের ব্যাখ্যায় কিন্তু পীরের দিক দিয়াই যান নাই, তিনি সমস্ত আয়েতটীর সাধারণ ভাবে অর্থ করেছেন। তিনি বলেছেন—"যদি আধ্যাত্মিক সিদ্ধি কামনা কর, তবে আল্লাহ্‌র প্রতি তোমার কর্ত্তব্য যথাযথ পালন কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর, এবং সে উপায় হচ্ছে এই যে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে বা তাঁর পথে চল্‌তে যথাসাধ্য ও আপ্রাণ চেষ্টা কর"।

কিন্তু স্বার্থ সন্ধিৎসু পীর সাহেবগণ 'পীরধরা' ব্যতীত "অছিলার" অন্য অর্থ খুজে পান নাই। হায়রে স্বার্থপরতা! আল্লাহ্ এই স্বার্থান্ধ ধর্ম্মপণ্ডিত ও ধর্ম্মযাজক দিগের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ কল্পে কোর্‌আনের একটী রুকু বা পরিচ্ছেদই অবতীর্ণ করেছেন তাহাতে অনেক গূঢ়রহস্য ও বিশেষ সতর্কবাণী আছে ব'লে আমরা এ স্থলে তার সারমর্ম্ম উদ্ধার করার চেষ্টা পাচ্ছি। এই রুকু হচ্ছে কোর্‌আনের সুরা মায়েদার ৭ম পরিচ্ছেদ। কোর্‌আন এই পরিচ্ছেদের ১ম আয়েতে অর্থাৎ এই সুরার ৪৭ আয়েতে বল্‌ছে যে তৌরাৎ হজরত মুসার নিকট অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং য়িহুদীদিগের ধর্ম্মপণ্ডিত ও ধর্ম্মযাজকদিগকে ইহার প্রতিভূ নিযুক্ত করা হয়েছিল—এই উদ্দেশ্যে যে ইহারা দেখ্‌বে যে হজরত মুসার পরে ইহা যথাযথ প্রচারিত হয়, ইহাতে কিছুই প্রক্ষিপ্ত না হয় এবং কিছুরই কদর্থ না করা হয়। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে ইহারাই সামান্য লোভের বশীভূত হয়ে আল্লাহ্‌র বাক্যের পরিবর্ত্তন ও কদর্থ করেছে। তাই এই সুরার ৪৯ আয়েতে বলা হয়েছে যে এদের কুকার্য্যে বাধাপ্রদান হেতু হজরত ইসার নিকট বাইবেল প্রেরণ করা হয় এই ব'লে যে বাইবেল আসল তৌরাতেরই পরিবর্দ্ধিত বিশুদ্ধ সংস্করণ, সুতরাং এবার যেন পূর্ব্বের কুকার্য্যের পুনরনুষ্ঠান না করা হয়। অতীব দুঃখের বিষয় এই যে খ্রীষ্টান ধর্ম্মপণ্ডিত ও ধর্ম্মযাজকগণও পূর্ণমাত্রায় অবাধ্যতা প্রদর্শন করতে কিঞ্চিন্মাত্রও পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই। তাই উক্ত সুরার ৫১ আয়েতে বলা হয়েছে যে এবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঐশীগ্রন্থের সারমর্ম্ম সহ পূর্ণ ঐশীগ্রন্থ কোর্‌আন হজরত মোহাম্মদের নিকট অবতীর্ণ করা হ'ল এবং স্বয়ং আল্লাহ্‌ই এবার

তার রক্ষার ভার গ্রহণ কর্‌লেন এবং এতদর্থে হজরত মোহাম্মদকে উহা মৌখিক শিক্ষা দেওয়া হ'ল এই উদ্দেশ্যে যে তাঁর অনুকরণে তাঁর ধর্ম্মাবলম্বীরা উহা কণ্ঠস্থ কর্‌বে এবং ধর্ম্মপণ্ডিত ও ধর্ম্মযাজকেরা লোভের বশীভূত হয়ে উহার আয়েতের পরিবর্ত্তন কর্‌তে পার্‌বে না। এতদ্দ্বারা ধর্ম্মগ্রন্থের পর ধর্ম্মগ্রন্থ পরিবর্দ্ধিত ক'রে অবতীর্ণ করার কারণ সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। হিন্দু ধর্ম্মপণ্ডিত ও ধর্ম্মযাজকগণও কম স্বার্থপর নহেন, বর্ণাশ্রম সৃষ্টি ক'রে এঁরাও কেবল স্বার্থান্ধতাই প্রদর্শন করেন নাই, অধিকন্তু আল্লাহে পক্ষপাতিত্ব আরোপ করেছেন এবং একই ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে ইতর বিশেষ ক'রে জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদান করেছেন। হজরতকে কোর্‌আন মৌখিক শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই কিন্তু আয়েতের পরিবর্ত্তন সাধিত করার ক্ষমতা লুপ্ত হলেও স্বার্থপর লোভী মুসলমান ধর্ম্মপণ্ডিতের অস্তিত্ব লোপ প্রাপ্ত হয় নাই। তাই এখনও আয়েতের কদর্থ করা হচ্ছে এবং তা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে; বৃহত্তর জামাতের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্রতর জামাতের জায়েজ হওয়ার সাপক্ষেও ফতওয়া পাওয়া যায়; পাশাপাশি একাধিক মস্‌জিদ জায়েজ হওয়ারও ফতওয়া পাওয়া যায়; অর্থের বলে স্থল বিশেষে সুদও জায়েজ হয়; মোট কথা, অর্থের মোহিনী মূর্ত্তি তেমন তেমন অনেক ধর্ম্মপণ্ডিতেরই মুখ বন্ধ কর্‌তে পারে। তালাক ব্যাপারে কি যে বীভৎস কাণ্ড মুসলমান সমাজে চলে যাচ্ছে তৎসম্বন্ধে অধিক না বলাই ভাল, এই ইঙ্গিতই যথেষ্ট হবে বোধ হয়। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, যে ধর্ম্মেই অনুসন্ধান করুন না কেন উক্ত সুরার ৫২ আয়েতের আল্লাহ্‌র বাণীর সত্যতা সপ্রমাণিত হবে, যথায় তিনি আক্ষেপ সহকারে বলেছেন যে "নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষ অবাধ্য।" এই সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে হজরত রছুলে করিম

বলেছেন যে এমন এক সময় আস্‌বে যখন আল্লাহ্‌র আদেশের ও তাঁর পয়গাম্বরের উপদেশের উপরেও টীকা টিপ্পনী চল্‌বে। সে সময়ের লক্ষণ এই যে তখন অবাধ ব্যভিচার হেতু নানা দুশ্চিকিৎস্য রোগের সৃষ্টি হবে, জাকাত একপ্রকার বন্ধ হবে যদ্ধেতু অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি দ্বারা দেশে নানা কষ্টের উদ্ভব হবে, কম ওজনে বিক্রয় ও বেশী ওজনে ক্রয় হেতু দেশে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হবে, রাজার বা শাসন কর্ত্তার অবিচার ও উৎপীড়ন হেতু যুদ্ধ বিগ্রহ ও অশান্তির সৃষ্টি হবে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ অপালন ও তাঁর পয়গাম্বরের উপদেশ অমান্য হেতু মানব সমাজে দলাদলি ও বিবাদ আরম্ভ হবে। আমাদের মনে হয় যে মেটিরিয়া-লিষ্টিক ভাবের প্রভাবে এখনই এসমস্তের সূত্রপাত সুরু হয়েছে। যাক্ আমরা একথা বলিনা যে 'অছিলা' অর্থে পীর বুঝাতেই পারেনা বা কোন অবস্থাতেই পীর ধরা উচিত নহে, তবে আজকাল অযোগ্য পীরের তথা এমন কি অনিষ্টকারী পীরের ছড়াছড়ি দেখে আমরা সকলকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি। এইপুস্তকে অনিষ্টকারী পীরের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। সুরা মায়েদার উল্লিখিত ৩৮ আয়েতকে নজির স্বরূপ প্রদর্শন ক'রে পীর সাহেবগণ সমাজে স্বীয় প্রতিষ্ঠা স্থাপন করার সুবিধা পেয়েছেন। তা কেবল ব্যবসাদার পীরেরাই নহেন, পাকা দুনিয়াদার চুনো পুঁটীগুলোও এই 'অছিলার' দাবী কর্‌তে একটু সঙ্কোচ বোধ করেনা। ব্যবসাদার পীরেরা যে 'অছিলার' দাবী কর্‌তে পারেন না তা পূর্ব্বোক্ত সুরা তওবার ৩৩ আয়েতের আল্লাহ্‌র সতর্ক বাণীই সাব্যস্ত ক'রে দিয়েছে, যাহাদের সাধারণ জ্ঞানও আছে তাহাদের নিকটেও ইহার অর্থ সুস্পষ্ট। অধিকন্তু ব্যবসাদার পীরদিগের যে বয়েত লওয়ার অধিকার নাই তা যথাস্থলে আমরা মৌলানা রুম্ প্রভৃতি মুসলমান মহাজ্ঞানী মহাপুরুষদের অভিমতের উল্লেখ ক'রে সপ্রমাণ করার চেষ্টা কর্‌ব। এক্ষণে কাহারা

এই অছিলার অন্তর্ভুক্ত আমরা তাহাই বিবৃত করার চেষ্টা কর্‌ছি। উপরি উক্ত মৌলানা রুম্ প্রভৃতি মহাজ্ঞানী মহাপুরুষদিগের মতে কামেল যাঁরা তাঁরা ও যাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটী গুণ আছে তাঁরা এই অছিলার অন্তর্ভুক্ত। উল্লিখিত পাঁচটী গুণ এই:—(১) কোর্‌আন ও হদিসে বিশেষজ্ঞ, (২) পক্ষপাতশূন্য, সম্পূর্ণ পরহেজগার এবং সর্ব্বথা দোষমুক্ত, (৩) নির্লিপ্ত ভাবে সংসার যাপন করেন এবং সংসারে থাকিয়াও আল্লাহ্-প্রেমে মুগ্ধ থাকেন, (৪) স্বীয় বাক্যে অটল থাকেন, প্রাণান্তে শরিয়ৎ বিরুদ্ধ কাজ করেন না এবং অন্যকে কর্‌তে দেখ্‌লে সাধ্য মত বাধা প্রদান করেন এবং (৫) কামেলের সেবা ক'রে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যুৎপন্ন হয়েছেন। তাঁরা আরও বলেন যে উল্লিখিত গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁরা মুরিদ কর্‌বেন তাঁরা মুরিদানকে সৎপথে চালাতে ন্যায়তঃ বাধ্য। তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অছিলা হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী সম্বলিত ঐশীগ্রন্থ কোর্‌আন। ইহাই হচ্ছে সর্ব্ব প্রধান সহায় ও যে সৌভাগ্য লাভের কথা অছিলা শব্দের পর ঐ আয়েতেই উল্লিখিত হয়েছে তার হেতু। পবিত্র কোর্‌আনই হচ্ছে ইহ ও পরকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বল। (মৎকৃত, 'কোর্‌আন প্রবেশিকা' নামিকা পুস্তিকার ভূমিকা দেখুন)। এই অছিলা দ্বারা হজরত রছুলে করিমকেও বুঝায়, কেননা তাঁর তাবেদারী ব্যতীত মুসলমান মুক্তির আশা করতে পারেনা। আল্লাহ্ কোর্‌আনকে মানবের একমাত্র নিশ্চিত সৎ পথ প্রদর্শক ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন সুরা 'বকর' এর ১৮৫ আয়েতে :—

انزل فيه القران هدى للناس و بينت من الهدى و الفرقان *

এবং উহাকে মানবের যাবতীয় মানসিক ব্যাধির অমোঘ ঔষধ ও তাঁর অনুগ্রহের নিদর্শন ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন সুরা বানি ইস্রাইলের ৮২ আয়েতে :—

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (لا) *

এবং সুরা আর্‌রাহ্‌মানের ১ম চারি আয়েতে বলেছেন যে তিনি ইহা মানবের নিকট পাঠায়েছেন এই জন্য যে ইহা না হ'লে তাদের চল্‌বেনা; কেননা ইহা তাদের আত্মার খাদ্য। এখানে সুরা আর্‌রাহ্‌মানের প্রথম চারি আয়েতের একটু ব্যাখ্যার আবশ্যকতা আছে ব'লে আমাদের মনে হয়। ঐ সকল আয়েত এই :—

اَلرَّحْمٰنُ (لا) عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ (ط) خَلَقَ الْاِنْسَانَ (لا) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ *

আর্‌রহ্‌মান, আল্লামাল্ কোর্‌আন, খালাকাল্ ইন্‌সান্ ও আল্লামাহোল্ বায়ান্—এই চারিটী আয়েতের অর্থ :—'অলৌকিক ব্যবস্থাকারী মানুষকে সৃজন ক'রে তাকে কোর্‌আন শিক্ষা দিয়াছেন এবং তাকে ভাব প্রকাশ কর্‌তে শিক্ষা দিয়াছেন।' এই চারিটী বাক্যে এত ভাব নিহিত আছে যে সংক্ষেপে তা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য, তবে তাদের সার মর্ম্ম এই যে কোর্‌আন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এই হেতু যে ইহা মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য অপরিহার্য্য রূপে দরকার এবং বাক্‌শক্তি দেওয়া হয়েছে এই হেতু যে তারা ইহার দ্বারা পরস্পরে ভাব বিনিময় ক'রে উন্নতি লাভ কর্‌বে এবং ইহাই জীবের মধ্যে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের হেতু হবে, এবং যেহেতু আল্লাহ্ পরম দয়াল ব্যবস্থাকারী তাই মানবের জন্য তাঁকে সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা কর্‌তে হয়েছে; তিনি তাদের জন্য শরীর ধারণোপযোগী খাদ্যের ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি তাদের আত্মার উৎকর্ষ সাধনোপযোগী খাদ্যেরও ব্যবস্থা করেছেন। এখানে প্রথমেই আর্‌রাহ্‌মান্ বা দয়াল ব্যবস্থাকারী শব্দের ব্যবহার করার

তাৎপর্য্যই এই। উক্তি আছে "মানুষ কেবল শরীর ধারণোপযোগী খাদ্য খেয়েই বাঁচে না —Man does not live on bread alone" অর্থাৎ মানুষের জন্য শরীর ধারণোপযোগী খাদ্যের যেমন দরকার তার জন্য তার আত্মার উৎকর্ষ সাধনোপযোগী খাদ্যেরও তেমনি দরকার। কোর্‌আনই হচ্ছে মানুষের আত্মার খাদ্য —"Spiritual food", এই জন্যই মানুষ সৃষ্টি ক'রে আল্লাহ্‌র তাকে কোর্‌আন শিক্ষা দেওয়ার দরকার হয়েছিল। অথচ কি পরিতাপের বিষয় যে অনেকেই ইহার বড় একটা ধার ধারেনা। তাই গেলাপে বন্ধ ক'রে ইহাকে তাকে অথবা শেল্‌ফে তুলে রাখে, তারা কখনও মনে করেনা যে ইহা তাহাদের একমাত্র প্রকৃত পরম সুহৃদ, নিদানের সম্বল, অন্ধকারের আলোক, একমাত্র নির্ভুল পথ প্রদর্শক এবং বিক্ষুব্ধ ও উদ্বেলিত হৃদয়ে শান্তিদাতা ( সুরা রা'দের ২৭ আয়েত ), কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঘরে আসল জিনিষ থাকৃতে তারা সটান দৌড়ে যায় ব্যবসাদার পীর ফকিরের কাছে—মন্ত্র লওয়ার জন্য, যারা প্রকৃত 'অছিলা' নহেন। না, না, কেবল ধার ধারিবার কথা নহে, এমন লোকও আমাদের মধ্যে আছে যারা এর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে। এরা হচ্ছে ঐ সকল মুদী বা বৈরাগীর মত লোক যারা কেবল শব্দ যোজনা কর্‌তে শি'খে টেনেটুনে সোনা-ভান বা রামায়ণ পাঠ করার মত কোর্‌আন পাঠ করে। না, না, এরা মুদী বৈরাগীর চেয়েও অধম, কেননা মুদী বৈরাগীরাও সোনাভান ও রামায়ণের ভাষা তাদের মাতৃভাষা ব'লে একটা কদর্থও করতে পারে বা অর্থবোধের চেষ্টা করে কিন্তু এরা যা টেনেটুনে পড়ে তার বিন্দু বিসর্গও বুঝেনা। এরা কিরূপে উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে তার একটা দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাচ্ছে। একদিন বৈরাগীদের আখড়ায় কৃষ্ণের ভজন হচ্ছে, বৈরাগী বাবাজীরা আবৃত্তি কর্‌ছেন "অশেষ ভকত গোরা নামনি রকত," আর ভক্তিভরে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়ে দিয়ে

বল্‌ছেন "হায়, প্রভুর না কত কষ্টই হয়েছিল''। তাঁরা অর্থ করেছেন যে ভক্তশ্রেষ্ঠ গোরা অর্থাৎ গৌরাঙ্গ প্রভুর নামনি অর্থাৎ পেট নেমেছে এবং 'রকত' অর্থাৎ রক্ত পড়্‌ছে। বিশদার্থ এই যে কৃষ্ণ ননী চুরি ক'রে খেয়েছিলেন কিন্তু বেশী পরিমাণে খেয়েছিলেন ব'লে পেটে বেদনা ও ডায়রিয়ার মত হয়ে রক্ত আম পড়্‌ছিল। আসল বাক্যটী কিন্তু হচ্ছে "অশেষ ভকত গোরা নাম নিব কত"। বৈরাগী বাবাজীরা একটী বিন্দু বা নকতার ভুল করেছিলেন মাত্র কিন্তু তাতেই অর্থের আকাশ পাতাল প্রভেদ হয়েছিল। আমরা তাই বল্‌তে যাচ্ছিলাম যে আসল অছিলার খোঁজ বড় একটা কেহ নেয়না, যদি বা কেহ নিতে চায় তাদের অনেকের দশা বৈরাগী বাবাজীদের চেয়েও অধিকতর শোচনীয়। আরও বিশেষ অনুধাবনের বিষয় এই যে আল্লাহ্‌ সুরা মোজ্জাম্মেলের ৯ আয়েতে হজরত রছুলে করিমকে আদেশ ক'রেছিলেন তাঁকেই উকিল বা অছিলা অবলম্বন কর্‌তে। ইহা প্রকারান্তরে মুসলমানের প্রতি ইঙ্গিত, فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا অর্থাৎ তাঁহাকেই (আল্লাহ্‌কেই) উকিল ধর। আমরা যথাস্থলে এবিষয়ে আল্লাহ্‌ চাহেত একটু বিস্তৃত আলোচনাই কর্‌ব।

এঁরা এঁদের পীর ফকিরী করার অধিকার স্থাপনের ও নিজেদের খ্যাতি প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য কোর্‌আন ও হদিসের কথা যেরূপে সুবিধা হয় লোকের নিকট সেইরূপেই ব্যাখ্যা কর্‌তে দ্বিধা বোধ করেন না, এমনকি তাঁরা যা নন তাই প্রতিপন্ন কর্‌তেও প্রয়াস পেয়ে থাকেন। সত্য বল্‌তে কি এঁরা লোকের মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে সক্ষম হয়েছেন যে অছিলা অর্থাৎ পীর অবলম্বন ব্যতীত কেহই স্বর্গে স্থান পাবেনা এবং এই বিশ্বাস তাদের মনে এরূপ দৃঢ় বদ্ধমুল হয়েছে যে যখনই কোন পীরের আগমন সংবাদ তারা শুন্‌তে পায়, তারা অমনি সাধ্যমত নজরানা সঙ্গে

নিয়ে শত কাজ ফে'লে তাঁর নিকটে দলে দলে উপস্থিত হয়ে তাঁর হস্তে বয়েত গ্রহণ করে, এক এক সময়ে গ্রাম কি গ্রাম, অঞ্চল কি অঞ্চল, এক সঙ্গে বয়েত গ্রহণ করে, তা তারা স্ত্রীলোক হউক, পুরুষ হউক, নাবালগ্ হোক্ আর প্রাপ্ত-বয়স্কই হোক্।

আপনারা চিন্তা ক'রে দেখেছেন কি এ সকল পীরের এরূপ করার উদ্দেশ্য কি? মুরিদানের সংখ্যা বেশী ক'রে দুপয়সা বেশী রোজগার করার মতলব নয় কি? অর্থ-লিপ্সা ইহাদিগকে এরূপ কাজে পরিচালিত করে নাত? যদি তাই হয়, তা হ'লে পবিত্র কোর্আনের সুরা ফোর্কানের ৪৩ আয়েত পাঠ করুন যাতে বলা হয়েছে * أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ

তুমি কি সেই ব্যক্তিকে বিশেষ রূপে লক্ষ্য করেছ যে (আল্লাহ্কে ভুলে) তার কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দেবতা জ্ঞানে তাদের তাবেদারী করে? এবং এই আয়েত এই সকল অর্থ লোভী পীরের প্রতি প্রযুজ্য কিনা চিন্তা ক'রে দেখুন। ঈদৃশ কার্য্য কলাপ, যারা পীরের নিকট বয়েত গ্রহণ করে কেবল তাদেরই সুবিবেচনা ও চিন্তাশক্তির অভাব প্রকাশ করেনা পরন্তু যাঁরা তাদের বয়েত লয়েন তাঁদেরও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রকাশ করে এবং ইহা যে একটা খাম-খেয়ালীর বিষয় তাহাও সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করে। ব্যবসাদার পীরেরাই বয়েত গ্রহণের কাজটাকে একটা খাম-খেয়ালীতে পরিণত করেছেন। আরও তাঁরা পীর ফকিরের যোগ্য কি না তা দেখা তাঁরা দরকার মনে করেন না; তাঁরা চান সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্তে এবং যদি পারেন ঐ সঙ্গে নামটা জাঁকাল কর্তে এবং সুখ স্বচ্ছন্দে থাকাই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ব'লে তাঁরা এটা দেখা আদৌ আবশ্যক মনে করেন না যে যারা মুরিদ হ'তে চায় তারা মুরিদ হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি কি না। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে কেহ কেহ পীর ফকিরীকে উত্তরাধিকার স্বত্বে প্রাপ্ত জিনিষে বা

মৌরসীতে পরিণত করেছেন সুতরাং উত্তরাধিকারী অযোগ্য হউক, দুশ্চরিত্র হোক্, তিনি পীর হবেন এবং বংশপরম্পরাগত মুরিদান এতই অপদার্থ যে এদের টুঁ শব্দ করার অধিকার নাই। এইত বয়েত! ভাল, এত মুরিদানের মধ্যে কি একজনও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি নাই? আর সমাজ? —সমাজ এ বিষয়ে বাক্‌শক্তিহীন। এই সকল পীর ও ফকিরের কার্য্য-কলাপের কুফল আমরা চতুর্দ্দিকে দেখ্‌ছি। এঁরা পুরোহিত নিপীড়িত জাতির লোকের চেয়েও মুসলমানকে অধম ক'রে তুলেছেন। কাজেই ইসলাম এঁদের দ্বারা লাভবান হয় নাই বরং হীনপ্রভ হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা যেমন ক'রে অন্যান্য বর্ণের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন, এঁরাও পবিত্র কোর্‌আনের বিবিধ ঐশীবাণী উপলক্ষ ক'রে ঠিক তদ্রূপে শিষ্যদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেছেন এবং নিরাপদে নিজেদের প্রভুত্ব চালিয়ে যেতে পারেন এই মানসে ব্রাহ্মণেরা যেমন ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোককে তর্ক কর্‌তে দিতে চান্ না তাদিগকে এই বুঝায়ে দিয়ে যে "বিশ্বাসেই মুক্তি তর্কে বহুদূর"। এখানে 'তর্ক' অর্থে 'কুতর্ক' বুঝায়, কিন্তু অনুসন্ধিৎসাকে কুতর্ক বলা নিশ্চয়ই সঙ্গত নয়। এই সকল ব্যবসাদার পীর ফকিরের অনেকে তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলেন এবং 'ধর্ম্ম বিষয়ে তর্কের স্থান নাই' ইহা ব'লে লোকের জান্‌বার স্পৃহা অঙ্কুরেই বিনাশ করেন, যদিও ইহা কোর্‌আনের শিক্ষার বিরোধী; কেননা পবিত্র কোর্‌আনে আল্লাহ্ স্বয়ংই প্রায়শঃ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, আয়েত সকল অনুধাবন করার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ তাকিদ করেছেন এবং অন্ধবিশ্বাসের নিন্দাবাদ করেছেন। হ'তে পারে যে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্ন ঠিক মুসলমান এতকাদ্ অনুযায়ী নহে, কিন্তু তাই ব'লে রাগান্বিত হয়ে তাড়ায়ে দেওয়া কি তাকে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে দেওয়ার তুল্য নহে? কেননা এরূপ কর্‌লে তারত আর সংশোধন হ'লনা। সুরা বকরের ২৬০ আয়েতে হজরত

ইব্রাহিমের (দঃ) কৌতুহল নিবৃত্তি ক'রে আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন যে কৌতুহল মানবের পক্ষে স্বাভাবিক, উহা সকল সময়ে অবিশ্বাসজনিত নাও হ'তে পারে, সুতরাং যাঁরা পারেন তাঁরা অপরের কৌতুহল নিবৃত্তির চেষ্টা করবেন। আল্লাহ্ যে অর্থবোধের বা মর্ম্ম গ্রহণের অত্যাবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করাতে চান তার বহু দৃষ্টান্ত আছে, একটীর এস্থলে উল্লেখ করা যাক্। পবিত্র কোর্‌আনের সুরা বকরের ১২১ আয়েতে আল্লাহ্ বল্‌ছেন :—

الذين اتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته (ط) اولئك

يؤمنون به (ط) *

" ঐ সকল লোক যাদিগকে কেতাব অর্থাৎ কোর্‌আন দেওয়া হয়েছে, যারাই উহা ঠিক ভাবে পড়ে তারাই উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে।" নিশ্চয় ঠিক ভাবে কোর্‌আন পড়ার অর্থ হচ্ছে উহার ভাবার্থ সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা, কেননা বিশ্বাস করতে হলেই আগে ভাল ক'রে বুঝা দরকার। ইহাই যে এর প্রকৃত অর্থ তা নিম্ন উদ্ধৃত আয়েত সকল হ'তে প্রতিপন্ন হবে—সুরা 'সাদ্' এর ২৯ আয়েত বল্‌ছে :—

كتب انزلنه اليك مبرك ليدبروا ايته وليتذكر

اولوا الالباب *

"তোমার নিকটে স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ পূর্ণ কেতাব পাঠায়েছি এই হেতু যে উহার আয়েত সকল লোকে চিন্তা ক'রে দেখ্‌বে এবং বুদ্ধিমানেরা

উহা বুঝ্তে পার্বে।" এই আয়েতে যা বলা হয়েছে তাতে দেখা গেল যে কেবল অর্থ বোধ নহে, চিন্তা করেও দেখ্তে হবে।

'উলুল্ আল্বাব্' শব্দ এখানে এই জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে কোর্আন বু'ঝে পড়া ও চিন্তা ক'রে দেখা তাঁদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। সাধারণের প্রতি ইহা প্রযুজ্য হ'তে পারেনা, কেননা কোর্আনের ভাষা অনেকের মাতৃভাষা নহে এবং অনেকের পক্ষে হয়ত কোর্আনের ভাষাজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে না। স্বতরাং কেহ যেন মনে না করে যে না বু'ঝে নামাজ পড়্লে বা কোর্আন তেলাওৎ কর্লে কোন উপকার হবেনা।

স্বুরা আন্ফালের ২২ আয়েত বল্ছে :—

ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون *

"বাস্তবিক আল্লাহ্র নিকট ঐ সকল লোকই নিকৃষ্ট পশু, মূক ও বধির, যারা বুঝেনা"।

পুনশ্চ স্বুরা 'জুম্আঃ'র ৫ আয়েত বল্ছে :—

مثل الذين حملوا التورت ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا (ط) *

"যাদের নিকট তৌরাৎ পাঠান হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা উহা বুঝে নাই এবং পাঠ করে নাই তাদের সহিত গাধার তুলনা হতে পারে, যারা পুস্তক বহনই করে মাত্র।"

আল্লাহ্ এসকল আয়েতে বল্লেন যে কেবল অর্থ বুঝ্বে না, চিন্তা

করেও দেখ্‌বে যেন তোমরা অন্ধবিশ্বাসী না হয়ে পাক্কা ইমানদার হ'তে পার। এই জন্যই আল্লাহ্‌ সুরা আন্‌কাবুতের ৪৫ আয়েতে বলেছেন "আমাকে স্মরণ করাই অর্থাৎ আমার সৃষ্টি, সৃষ্টি-কৌশল, অলৌকিক ব্যবস্থা, দয়া, ক্ষমাশীলতা, মাহাত্ম্য ইত্যাদির (অর্থাৎ সুরা ফাতেহায় বর্ণিত তাঁর চারিটী প্রধান গুণের যথা —(১) রব্‌ (২) রহ্‌মান্‌, (৩) রহিম্‌ ও (৪) মালেকের ) অনুধাবনই হচ্ছে প্রকৃত উপাসনা।"

এক্ষণে পূর্ব্ববর্ণিত সুরা তওবার ৩১ আয়েতের আল্লাহ্‌র সতর্কবাণীর পরে বিশেষজ্ঞ মুসলমান মহাপুরুষেরা পীর সম্বন্ধে কি বলেন তাহাও শুনুন—স্বনাম ধন্য মৌলানা রুম্‌ বল্‌ছেন যে মানব বেশধারী অনেক শয়তান পীর-রূপে লোক সমীপে উপস্থিত হয়, অতএব সাবধান, সকলের হাতে হাত স্থাপন ( বয়েত গ্রহণ ) করোনা। তাঁর মতে কামেল ব্যতীত ( সিদ্ধ মহাপুরুষ ব্যতীত ) অপরের হস্তে বয়েত গ্রহণ করা উচিত নয়; কেননা, তিনি সামান্য পায়ের কাঁটার দৃষ্টান্ত দিয়ে বল্‌ছেন যে পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে তা বাহির করার জন্য কত কিছুই না করতে হয়, পা জানুর উপরে স্থাপন করা, প্রথমতঃ সূচের অগ্রভাগ দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখা কোথায় উহা আছে, তাতে না হলে পানি দিয়ে স্থানটি পরিষ্কার করা ও তৎপর নানা কৌশলে কাঁটা বাহির করা। এক্ষণে সামান্য পায়ের কাঁটা বাহির করতে যদি এত কিছু করতে হয় তাহলে অন্তঃকরণের কাঁটা তুলে ফেলা কি যে সে লোকের কাজ? দিল্লীর সুবিখ্যাত অলি মরহুম্‌ শাহ্‌ আবদুর্‌ রহিম সাহেবের সুযোগ্য পুত্র স্বনাম ধন্য শাহ্‌ অলি উল্লাহ্‌ সাহেব নানাবিধ ইল্‌মে তাসাওফ্‌ সম্বলিত গ্রন্থাদি মন্থন করতঃ তাঁর কৃত কওলুল্‌ জমিলে লিখেছেন যে বয়েত ওয়াজেব নহে, উহা সুন্নত। উহা যে সুন্নতে মোয়াক্কাদা তারও কোন প্রমাণ নাই; কেননা, শরিয়তে বয়েত তরক্‌ করনেওয়ালার গুনাহ্‌গার হওয়ার সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই অর্থাৎ

কোর্‌আন এবং হদিসেও বলা হয় নাই যে বয়েত গ্রহণ না কর্‌লে গুনাহ্‌গার হ'তে হবে এবং বয়েত গ্রহণ না করার দরুণ কেহ তাদেরকে তম্বী বা তাকিদও করেন নাই। অথচ ব্যবসাদার পীর ফকিরেরা লোকের ধারণা জন্মায়ে দিয়াছেন যে বয়েত গ্রহণ না কর্‌লে নিস্তার নাই, এমনকি, তাদের হাতে কোন জিনিষ খাওয়াও ঠিক নহে। পীরের যোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে পূর্ব্ব বর্ণিত ৫টী গুণ যাঁতে নাই, তিনি বয়েত লওয়ার যোগ্য নন্। উক্ত ৫টী গুণ আমরা ইতি পূর্ব্বে যথাস্থানে বিবৃত করেছি। উহাদের সারমর্ম্ম এই যে তাঁরা কোর্‌আনে ও হদিসে বিশেষজ্ঞ ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে সম্যক ব্যুৎপন্ন, নির্ম্মল চরিত্র, তারেক্ দুনিয়া ও রাগেব্‌-ওক্‌বা হবেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌গত প্রাণ হয়ে নির্লিপ্ত ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌বেন। নির্লিপ্তভাবে সংসার যাত্রা যাপন করার একটী সুন্দর উপদেশ আছে—মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস একটী রূপক অলঙ্কার দ্বারা নির্লিপ্ত ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করার উপদেশ দিয়াছেন এই ব'লে যে কাঁঠালের আঁঠা হাতে না লাগে এইজন্য যেমন লোকে হাতে তেল লাগায়, তেমনি সংসারের আঁঠা হ'তে অব্যাহতি পেতে হ'লে আল্লাহ্-প্রেম-রূপ-তেল ব্যবহার কর্‌তে হয়। দৃষ্টান্তটী শ্রুতিমধুর হলেও সহজবোধ্য নহে, কেননা "আল্লাহ্-প্রেমের" ধারণা করা ত দূরের কথা, আল্লাহ্‌র ধারণাই করা কঠিন ব্যাপার। সত্য বল্‌তে কি, আল্লাহ্‌র স্বরূপের সঠিক ধারণা অনেকেরই নাই। অধিকন্তু শরীরী জিনিষের সহিত অশরীরী জিনিষের তুলনা সকল সময়ে সহজবোধ্য ত হয়ই না, স্থলবিশেষে পথভ্রষ্টকারিণী হয়ে থাকে, যেমন মৃত্তিকা, ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত পথের সহিত ধর্ম্মপথের তুলনা ( মৎকৃত কোর্‌আন প্রবেশিকার সুরা ফাতেহার টীকা দ্রষ্টব্য )। নির্লিপ্তভাবে সংসারে জীবন যাপন করার

অর্থ কি ঐশীগ্রন্থ কোর্‌আন সুরা ফোর্‌কানের ৪৩ আয়েতে অতি সরল বাক্যে মানুষকে তা শিক্ষা দিয়াছে এই ব'লে যে, যেহেতু তার সৃষ্টি, রক্ষা ও পালনকর্ত্তা আল্লাহ্‌র চেয়ে কেহই তার অধিকতর ভালবাসার পাত্র হ'তে পারেনা, অতএব সে যেন সংসারকে বা ভোগবিলাসকে অথবা ধন-জন-বিষয়-কামনাকে অত্যধিক ভাল না বাসে বা সহজ কথায় সে যেন রিপুসমূহকে আল্লাহ্‌র আসনে উপবেশন করায়ে তাদের পূজা না করে অর্থাৎ সংসারে মত্ত হয়ে সে যেন আল্লাহ্‌কে ভু'লে না যায় বা পরকালে অবিশ্বাসী না হয়। আমাদের মনে হয় যে পরমহংস 'আল্লাহ্‌-প্রেম-রূপ-তেল' দ্বারা 'আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসা'কেই নির্দ্দেশ ক'রে থাক্‌বেন। পূর্ব্বোক্ত মহামান্য শাহ্‌ অলিউল্লাহ্‌ সাহেব ইহাও বলেন যে যাঁরা বয়েত লয়েন তাঁরা মুরিদানকে সৎপথে চালিত করতে ন্যায়তঃ বাধ্য। অথচ ব্যবসাদার পীর ফকিরেরা মুরিদানের বড় একটা তত্ত্ব লন্‌না; অনেকেই জানেন যে তাঁদের মুরিদানের অনেকেই এমন কি রীতিমত ৫ বার নামাজ পড়েনা, কিন্তু এমতাবস্থায়ও তাঁদের বড় একটা উচ্চ বাচ্য করতে শোনা যায় না। হায়রে ব্যবসাদারী! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই!! এই সকল পীর ফকিরেরা যে ভাবে অর্থ শোষণ বা আদায় তহ্‌শীল করেন তা শিষ্যমণ্ডলী ভাল ভাবেই জানে, অপরেও যে কতকটা না জানে তা নয়, কিন্তু এই অর্থ শোষণকে আমরা তত গুরুতর বিষয় মনে করিনা, শিষ্যদিগের বিশ্বাস ও ধারণার বিকৃতিকে যতটা আমরা মারাত্মক মনে করি। খৃষ্টানদিগের যেমন ধারণা আছে যে হজরত ইসা (দঃ) তাদের পাপ বহন ক'রে নিয়ে গেছেন, এঁদের শিষ্যদিগের কাহারও কাহারও ধারণাও কতকটা এই ধরণের, অন্ততঃ তারা বিশ্বাস করে যে পীর সাহেব কেবলা তাদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং সে

সুপারিশ আল্লাহ্ কর্ত্তৃক গৃহীত হবে। বাস্তবিক, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে আল্লাহ্‌র অতি পরিষ্কার আদেশ থাকা সত্ত্বেও লোকে কিরূপে রোজ কেয়ামতে হিসাব নিকাশ দেওয়ার দায় হ'তে অব্যাহতি পাওয়ার আশা কর্‌তে পারে? কেননা পবিত্র কোর্‌আনের সুরা জিল্‌জালের ৬-৮ আয়েতে আল্লাহ্ বল্‌ছেন :—

يومئذ يصدر الناس اشتاتا (لا) ليروا اعمالهم (ط) فمن يعمل مثقال

ذرة خيرا يره ۝ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ۝ *

"সেই (কেয়ামতের) দিন মানুষকে পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করা হবে যেন তারা তাদের কৃত কর্ম্ম দেখ্‌তে পায় (এই জন্য)। অতঃপর যে ব্যক্তি রতি পরিমাণ ভাল কাজ করেছে সে তা দেখ্‌বে এবং যে রতি পরিমাণ মন্দ কাজ করেছে সেও তা দেখ্‌বে।" আল্লাহ্ সুরা এন্‌ফেতরের ১৯ আয়েতে আরও বল্‌ছেন :—

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا (ط)

"সেই (কেয়ামতের) দিন কেহ কাহারও কোন প্রকারে সহায়তা কর্‌তে পার্‌বে না।" আল্লাহ্ পুনশ্চ সুরা বানি ইস্রাইলের ১৫ আয়েতে বল্‌ছেন :—

ولا تزر وازرة وزر اخرى (ط) *

"যার নিজেরই বোঝা আছে, সে অন্যের বোঝা বহন কর্‌বে না"। ইহা দ্বারা বয়েত-গ্রহণকারী ও মুরিদান দুই পক্ষকেই সতর্ক ক'রে দেওয়া

হয়েছে। ইহার ফলিতার্থ এই যে অন্যের বোঝা নিতে হলে আমাদিগকে আগে নিজে বোঝাশূন্য হ'তে হবে। এই জন্যই বোধ হয় মৌলানা রুম্ প্রভৃতি মহামনীষীরা বলেছেন যে কামেল বা তত্তুল্য সাধুমহাপুরুষেরাই কেবল বয়েত গ্রহণের অধিকারী। কেবল সুরা বাণি ইস্রাইলে নহে, আরও কয়েকটী সুরায় এই ভাবের কথা বলা হয়েছে, যেমন সুরা আন্‌আমের ১৬৫ আয়েতে, সুরা নজমের ৩৮ আয়েতে এবং সুরা আন্‌কাবুতের ১১ আয়েতে। এমনকি এতদ্দ্বারা খৃষ্ট কর্ত্তৃক পাপীর পাপ মোচন (atonement) রূপ খৃষ্টানদিগের ভ্রান্ত বিশ্বাসেরও প্রতিবাদ করা হয়েছে। এখানে 'বেজ্‌রা' শব্দের ঠিক বঙ্গানুবাদ হচ্ছে "দায়িত্ব" (responsibility)। পবিত্র কোর্‌আন সুরা আন্‌কাবুতের ৭ আয়েতে জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেছে যে কেবল সৎকর্ম্মই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা পাপ ক্ষয় কর্‌তে পারে।

ভাল, পীর ফকির সাহেবরা কি বল্‌তে পারেন যে তাঁদের নিজেদের বোঝা নাই? যদি থাকে, তবে কোন সাহসে তাঁরা এ আদেশ অমান্য করতে যান্। আর মুরিদানের জানা উচিত যে নিশ্চয়ই মানুষ তার নিজের বোঝা অন্যের ঘাড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে না, তার বোঝা তাকেই বহন কর্‌তে হবে। সে যে তার নিজের কার্য্যের জন্য দায়ী তা তার ভুল্‌লে চল্‌বে কেন?—সুরা 'আহ্‌জাব্' এর ৭২ আয়েত। সে যে সৃষ্টির শেরা, তার মত সৌভাগ্যবান কে? আল্লাহ্ কি তাকে পৃথিবীতে খলিফা ক'রে পাঠান নাই?—সুরা ইউনুসের ১৪ আয়েত। খলিফা হওয়ার উপযোগী সমস্ত গুণই তাতে নিহিত ক'রে আল্লাহ্ তাকে পাঠায়েছেন, আল্লাহ্ বল্‌ছেন :—

الذی خلق فسوی - والذی قدر فهدی *

—সুরী আ'লার ২ ও ৩ আয়েত।

ব্যাখ্যা :—"আল্লাহ্, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, যে পরিমাণ যে গুণ তোমাতে দরকার তা সমস্তই তোমাতে নিহিত ক'রে তোমাকে উপযুক্ত জ্ঞানে বিভূষিত ক'রে পূর্ণত্ব প্রদান করেছেন এবং তোমাকে তোমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী ক'রে পথ প্রদর্শন করেছেন।"

অতএব মানুষ যে সমস্ত উপাদানে গঠিত তৎসমস্তের উৎকর্ষ সাধন কর্‌তে সে বাধ্য, আল্লাহ্ তাতে যে সমস্ত বৃত্তি নিহিত করেছেন তৎসমস্তের সদ্ব্যবহার ক'রে তাকে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন কর্‌তে হবে। ডাক্তার নিজের শরীরে অস্ত্রোপচার ক'রে বা নিজে ঔষধ সেবন ক'রে রোগী ভাল কর্‌তে পারেন না তা সে বেশ জানে ও ভাল রকমেই বুঝে এবং ডাক্তাররাও তাকে কোন দিন বলেননা যে তার শরীরে অস্ত্রোপচার দরকার হবেনা বা তাকে ঔষধ সেবন কর্‌তে হবেনা, তবে সে কেন তার বোঝা অপরের ঘাড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চায়?

পুনশ্চ সে কি জানেনা যে আল্লাহ্ তাকে পবিত্র গ্রন্থ কোর্‌আনে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করায়ে দিয়েছেন যে তাকে তাঁর নিকট যেতে হবে। কোন মুসলমান মর্‌লেও বল্‌তে হয় "ওয়াইন্না এলায়হে রাজেউন্" —ইহার অর্থ "এবং নিশ্চয়ই তাঁর নিকট যেতে হবে"। এক্ষণে আল্লাহ্‌র নিকট তাকে যেতে হবে একথা তিনি পুনঃ পুনঃ তাকে স্মরণ করায়ে দেন কেন? এর উদ্দেশ্য কি, তাকি সে কোন দিন অনুধাবন কর্‌তে চেষ্টা করেছে, না, মন্ত্রের মত সে একথা কেবল শুনে ও আওড়ায়? সে কি মনে করে যে আল্লাহ্‌র নিকট তাকে যেতে হবে দেখা কর্‌তে বা নিমন্ত্রন রক্ষা কর্‌তে? না, না, তার ভুলে গেলে চল্‌বেনা যে তাকে তাঁর নিকট হিসাব নিকাশ দিতে যেতে হবে। আল্লাহ্ এই জন্যই

তাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন যে হিসাব নিকাশের কথা সর্ব্বদা মনে রেখে, সে নিজেকে সৎপথে চালিত করুক—তিনি বল্‌ছেন :—

افحسبتم انما خلقنكم عبثا و انكم الينا لا ترجعون *

—সুরা মোমেন্নুনের ১১৫ আয়েত।

"তোমরা কি মনে কর যে বিনা উদ্দেশ্যে আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছি? এবং তোমাদিগকে আমার নিকট আস্‌তে হবে না (তোমাদের কাজের হিসাব নিকাশ দিতে)?

অধিকন্তু 'যে, সে ব্যক্তি' যে সুপারিশ কর্‌তে পারবেনা, ইহা প্রত্যেক মুসলমানের জানা উচিত। কেন, এই সকল মুরিদান কি জানেনা যে কেবল মাত্র হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহো আলায় হেচ্ছালামই সাধারণ ভাবে শাফা-আতের অধিকার পেয়েছেন? হজরত কেন এরূপ বিশেষ অধিকার পেয়েছেন, তার কারণ এই যে তিনি শেষ পয়গাম্বর (খাতেমুন্নবীয়িন্) ও সমস্ত জগতের জন্য প্রেরিত (রহ্‌মতুল্লিল্ আলামিন্)। অন্য কোন পয়গাম্বরই সমস্তজগতের জন্য প্রেরিত হন নাই, সুতরাং এ অধিকার তাদের প্রাপ্য হ'তে পারে না। সমস্ত জগতের জন্য তিনি প্রেরিত হলেন কেন? কারণ এই যে যাদের নিকট পূর্ব্বে কোন পয়গাম্বর প্রেরিত হন নাই তারা যেন পয়গাম্বর পাওয়ার সুযোগ হ'তে বঞ্চিত না হয়, কেননা তাঁর পরে আর কোন পয়গাম্বর প্রেরিত হবেন না (সুরা মায়েদার ১৯ আয়েত) এবং এই জন্যই ইসলামকে পূর্ণত্ব প্রদান ক'রে মানবের স্বভাবধর্ম্ম করা হয়েছে যেন ইহা অবিসংবাদিত রূপে

জগতের সকলের গ্রহণীয় হ'তে পারে। এসমস্ত বিশদরূপে জান্‌তে হলে মৎকৃত কোর্‌আন প্রবেশিকা পাঠ করুন।

শাফা-আত শব্দের অর্থের ঠিক ধারণা অনেকেই কর্‌তে পারেন নাই, তাই এস্থলে ইহার একটু বিস্তৃত আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক মনে করি। শাফ্‌ ধাতু হ'তে শাফা-আত শব্দের উৎপত্তি। শাফ্‌ ধাতুর অর্থ একটী জিনিষকে আর একটীর মত করা অথবা একটীকে তারই মত আর একটীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া। সুতরাং যিনি শাফা-আত কর্‌বেন তাঁর মত হ'তে হবে বা তাঁর সৎ কাজের সঙ্গী হ'তে হবে—ইহা দ্বারা এই অর্থই প্রকাশ পায়। আমরা ঐশী মহাগ্রন্থ কোর্‌আনের পবিত্র আয়েত সকলের উল্লেখ ক'রে ইহার বিশদ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। মহাগ্রন্থ কোর্‌আনের চারিটী স্থানে ইহার বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ঐ চারিটী স্থান এই :—সুরা বকরের ৪৮ আয়েত, ঐ সুরার ২৫৪ আয়েত, সুরা নেছার ৮৫ আয়েত এবং জোখ্‌রাফের ৮৬ আয়েত। সুরা বকরার ৪৮ আয়েত এই :—

و اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا و لا يقبل منها شفاعة

و لا يؤخذ منها عدل و لا هم ينصرون *

ইহাতে য়িহুদীদিগকে লক্ষ্য ক'রে বলা হয়েছে যে তারা কেবল অসৎ কাজে লিপ্ত থাক্‌লে এবং কুপথ ত্যাগ করার চেষ্টা না কর্‌লে তাদের জন্য কাহারও সুপারিশ গ্রহণ করা হবেনা। এতদ্দ্বারা বিশ্বাসী

দিগকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে সৎপথে থাকতে ও অসৎপথ ত্যাগ করতে চেষ্টা না করলে তারা সুপারিশের আশা করতে পারে না।

সূরা বকরের ২৫৪ আয়েত এই :—

يا يها الذين امنوا انفقوا مما رزقنكم من قبل ان ياتى يوم

لا بيع فيه و لا خلة و لا شفاعة (ط) *

ইহাতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করলে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সত্যধর্ম্ম (সত্যিকার একেশ্বরবাদ) রক্ষার্থ ত্যাগ স্বীকার না করলে তাদের জন্য আল্লাহ্ সুপারিশের অনুমতি দিবেন না।

সূরা নেছার ৮৪ ও ৮৫ আয়েত এই :—

فقاتل في سبيل الله (ج) لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين (ج)

عسى الله ان يكف باس الذين كفروا (ط) و الله اشد باسا و اشد تنكيلا ـ

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها (ج) ومن يشفع شفاعة

سيئة يكن له كفل منها (ط) وكان الله على كل شيء مقيتا *

এই দুই আয়েতের প্রথম আয়েতে বদরের ঐ যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে যাতে হজরত রছুলে করিম একাই যুদ্ধার্থ বহির্গত হয়েছিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ৭০ জন বিশ্বাসী তাঁর অনুগমন করেন, অপরেরা যুদ্ধে যোগদান কর্‌তে সাহস করে নাই এই হেতু যে এক মিথ্যা গুজব রটিত হয়েছিল যে শত্রুরা অসংখ্য সৈন্য যুদ্ধার্থ সমবেত করেছে। তাই যে সকল দুর্ব্বলচিত্ত ও কপটাচারী যুদ্ধে যোগদান ক'রে হজরত রছুলে করিমের অনুসরণ কর্‌তে ইতস্ততঃ কর্‌ত, তাহাদিগকে লক্ষ্য ক'রে বলা হয়েছে যে যারা সৎ কাজে আল্লাহ্‌র অনুগৃহীত একান্ত অনুগত ভৃত্যদের সহযোগিতা কর্‌বে তাদের জন্য তাঁহাদিগকে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করা হবে।

সুরা জোখ্‌রাফের ৮৬ আয়েত এই :—

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ

بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ *

ইহাতে ইহুদী ও খৃষ্টানদিগকে লক্ষ্য ক'রে বলা হয়েছে যে তারা যাদিগকে আল্লাহ্‌র তুল্য বা অংশ বোধে দেবতার আসনে বসায়েছে তারা তাদের জন্য সুপারিশ কর্‌তে পার্‌বেনা, শেষ পয়গাম্বর যিনি সত্যিকার একেশ্বর-বাদ ঘোষণা কর্‌তে প্রেরিত হয়েছেন, তাঁরই নির্দ্দেশিত পথে চল্‌লে তিনিই তাদের জন্য সুপারিশ কর্‌বেন।

উল্লিখিত আয়েত সমুহে দুই প্রকারের শাফা-আতের উল্লেখ করা হয়েছে—(১) শেষ প্রেরিত পয়গাম্বর শাফা-আত কর্‌বেন, তাদের জন্য যারা তাঁর নির্দ্দেশিত পথে চল্‌তে চেষ্টা কর্‌বে, যদিও তারা মানব-স্বভাব-সুলভ দুর্ব্বলতা হেতু নিজকে সাম্‌লাতে সক্ষম না হয়। ইহা বিশেষ অনুধাবন যোগ্য যে মুসলমান ব'লে তাঁর শাফা-আতের দাবী কর্‌লে চলবে না, তাঁর তাবেদারীর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে; কেননা সুরা হোজ্‌রাতের ১৭ আয়েতে আল্লাহ্‌ বল্‌ছেন—

يمنون عليك ان اسلموا (ط) *

"তারা কি মনে করে যে তারা মুসলমান হয়েছে ব'লে তারা তোমাকে বাধিত করেছে ?" অর্থাৎ তারা ইসলাম কবুল কর্‌লেই তুমি শাফা-আত করতে বাধ্য হবে ? এর চেয়ে পরিষ্কার কথা আর কি হ'তে পারে ? মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে দস্তুর মত তাবেদারীর চেষ্টা না কর্‌লে তিনি শাফা-আত কর্‌বেন না।

(২) যাঁরা আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত ভৃত্য, সৎকাজে তাঁদের সহযোগিতা কর্‌লে বা তাঁদের জানিত কোনও সৎকাজে কাহারও সহযোগিতা বা সহায়তা কর্‌লে তাদের জন্য এই সমস্ত আল্লাহ্‌গত-প্রাণ কামেল মহাপুরুষগণ কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌ কর্তৃক সুপারিশ করার অনুমতি প্রাপ্ত হবেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাদিগকে বল্‌বেন যদি এমন কেহ তোমাদের জানিত ব্যক্তি থাকে যারা সৎকাজে সহযোগিতা করেছে তোমরা তাদের জন্য শাফা-আত কর। অথচ এই ব্যবসাদার

পীরেরা, আমরা জানিনা, কোন দলিলের বলে তাঁদের মুরিদানকে আশ্বাস দেন যে তাঁরা তাদের জন্য সুপারিশ করবেন, তবে কি তাঁরা আল্লাহ্-গত-প্রাণ কামেল মহাপুরুষের দাবী করেন?

আপনারা এখন দেখ্‌লেন যে কে বা কাহারা এবং কি অবস্থায় তিনি বা তাঁরা শাফা-আত কর্‌তে পার্‌বেন। ইসলামে যোগ্যতার কদর আছে, মুড়ি মিছরীর একদর এখানে নাই, অযৌক্তিকতা ইহার ত্রিসীমায় আস্‌তে পারে না।

সর্ব্বশেষে আমরা কি ব্যবসাদার পীর ফকিরকে সসম্মান জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারিনা যে আধ্যাত্মিকতার বিষয়েও কেনা বেচার ব্যাপার কেন? যদি তাঁরা বিনা পয়সায় উপদেশ দিতে না পারেন ও তাঁদের গুপ্তমন্ত্র গুলিকে অমূল্য রত্ন মনে করেন, তাহলে তাঁরা উপদেশ দিতে বিরত থাকলেই পারেন, মোক্ষকামীরা তাদের পথ দেখে নিক্? কেননা যে আল্লাহ্ সকলের প্রতিপালক, পরম দয়ালু, সমগ্র জগতের ব্যবস্থাকারী ও যাঁর কুদরতের ( মহিমার ) সীমা নাই, তিনি কি তাঁর বান্দাদিগকে সাহায্য কর্‌তে সক্ষম নন? শুনুন, সুরা মোজ্জাম্মেলে তিনি তাঁর বান্দাদিগকে কি বল্‌ছেন :—

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا *

"পূর্ব্বও পশ্চিমের মালিক অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের অধিপতি যিনি তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই ( ও সাহায্যকারী নাই )। অতএব তাঁকেই উকীল ( পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী ) ধর।" তাঁর সান্নিধ্যলাভ বা স্বর্গ প্রাপ্তির

জন্য তাঁর ভৃত্যাদিগকে তাঁকেই উকিল বা পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী-রূপে গ্রহণ কর্‌তে হবে অর্থাৎ তাঁর বিশ্বাসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও তাঁর উপর নির্ভরশীল ভৃত্যকে অন্যের দ্বারস্থ বা অন্যের মুখাপেক্ষী হ'তে হবেনা— দয়াল প্রভুর, রাব্বুল্ আলামিন ও রহমানুর্ রহিমের উপযুক্ত কথাই বটে। কখন এবং কেন সে সময় তাঁর পরামর্শ গ্রহণের উপযুক্ত সময় তাহাও তিনি তাঁর বান্দাদিগকে ব'লে দিয়েছেন পূর্ব্বোক্ত আয়েতের একটু আগে :—

ان نا شئة الیل هی اشد وطا و اقوم قیلا *

শেষরাত্রে উঠা অসুবিধাজনক হলেও সেই নিস্তব্ধ সময়েই অনন্যমনা হয়ে উপাসনা করার উপযুক্ত সময়, কেননা তখনকার উচ্চারিত প্রত্যেক শব্দ হৃদয় স্পর্শ করে। অধিকন্তু দিবা রাত্রের পাঁচ বার নামাজ-আদায়রূপ তাঁর আদেশ প্রতিপালন ক'রে তাঁর উপদেশ গ্রহণ কর্‌তে যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত, কেননা উকিলের উপদেশ মত কাজ না কর্‌লে তাঁর পরামর্শের কি সার্থকতা আছে বরং তাতে তাঁর ক্রোধেরই কারণ হয়। তাই তিনি দৈনন্দিন কার্য্যের জন্য তাঁর পরামর্শ লাভের সর্ত্ত দিয়াছেন উক্ত সুরার ১৯ আয়েতে :—

و اقیموا الصلوة و اتوا الزکوة و اقرضوا الله قرضا حسنا (ط) *

"নামাজ প্রতিষ্ঠা কর, জাকাত প্রদান কর ও আল্লাহ্‌কে কর্জ্জ হাসানা দেও।" কিন্তু যদি কোনও কারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কিছু না কর্‌তে

পার, অকপটে সরলচিত্তে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করো, দয়াল আল্লাহ্ বল্‌ছেন ঐ সুরার শেষে যে তিনি ক্ষমাশীল :—

واستغفروا الله (ط) ان الله غفور رحيم *

সুরা মোজাম্মেলে আল্লাহ্ হজরত রছুলে করিমকে লক্ষ্য করেই সমস্ত কথা বলেছেন, কিন্তু তা হলেও বিজ্ঞদিগের মতে উহা সকল বান্দা-দিগের প্রতিই তাঁর ইঙ্গিত। এই সুরার প্রত্যেক ছত্রে যেন মানবের প্রতি তাঁর দয়া ও ভালবাসা উছ্‌লিয়ে পড়ছে। আমরা অন্যত্র ইহার সার মর্ম্ম প্রদান করেছি।

বাস্তবিক, আল্লাহ্‌র আদেশ ও উপদেশ পালন না ক'রে বা পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা না-ক'রে কোন্ যুক্তির বলে ও কোন্ মুখে আমরা বল্‌ব "দয়ালপ্রভু, আমরা তোমার বিশ্বস্ত কর্ত্তব্য-পরায়ণ ভৃত্য, আমাদিগকে ক্ষমা কর ও সৎপরামর্শ দেও।" দয়াল প্রভুর আদেশ পালন ক'রে চিত্তকে ক্রমশঃ শুদ্ধ বুদ্ধ কর, দেখ্‌বে তাঁর পরামর্শ ও সাহায্য অবতীর্ণ হচ্ছে এবং ক্রমশঃ তোমার রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, তখন তোমাকে আর অন্যের দ্বারস্থ বা অন্যের সাহায্য-প্রার্থী হ'তে হবেনা। তাই আমরা বল্‌তে চাই যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাঁর বান্দাদিগকে যদি সাহায্য না করতে পারেন, নাই কর্‌লেন কিন্তু তাদিগকে বিভক্ত কর্‌বেন না। আপনাদের কাজ পার্থক্য দূরীভূত করা, না তা আরও বর্দ্ধিত ক'রে দেওয়া ?

হয়ত তাঁদের শাফাই গেতে গিয়ে তাঁদের কোন অন্ধভক্ত আমাদিগকে বল্‌বেন যে এদের শিষ্যসংখ্যা কত অধিক ও কত ভাল ভাল লোক

ঐ সংখ্যার মধ্যে আছেন তা জানেন কি? পূর্ব্বে যে স্থানে গ্রাম কি গ্রাম ও অঞ্চল কি অঞ্চলের স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে আবাল বৃদ্ধ সকলের বয়েত গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে সেই স্থানেই আমরা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি যে বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের বয়েত গ্রহণ প্রথা একটা নিছক খামখেয়ালীর ব্যাপার, একটা হুজুগ মাত্র—সুতরাং যাঁর সামান্য বিচার-শক্তি আছে তাঁর নিকট ইহার গুরুত্ব অতি সামান্য। তত্রাচ প্রশ্নের দ্বিতীয় ভাগের উত্তরে আমরা তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রম অনুরোধ করি যে তাঁরা যেন পুনর্ব্বার আয়েত সকল পাঠ করেন, বিশেষতঃ ঐ আয়েতটী যাতে ঐশীসতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম ভাগের উত্তরে ব্যবসাদার পীর দিগের দায়িত্বজ্ঞানশূন্যতা সম্বন্ধে তাঁদিগকে অবহিত করার জন্য আমরা সুলতান মাহ্‌মুদ গজনী ও একটী বৃদ্ধার মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তারই সারমর্ম্ম এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি। বৃদ্ধা, সুলতান সমীপে এক বিষম অভিযোগ কর্‌লে সুলতান তাকে বলেছিলেন যে তাঁর রাজ্য এত বিস্তৃত যে সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দে'খে উঠা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নহে। ইহাতে নাকি বৃদ্ধা বিরক্তির সহিত বলেছিলেন "আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে অত বড় রাজ্য রাখ্‌বেন না, যা আপনি সুশাসন কর্‌তে অক্ষম।"

আর একটী কথারও আলোচনা এখানে হওয়া উচিত। ইসলামের সাদাসিধে সম্ভাষণ "আচ্ছালামো আলায়কুম্‌" হজরত রছুলে করিমের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উপযুক্ত অভিব্যঞ্জক নহে মনে ক'রে কেহ কেহ একদিন হজরতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা তাঁকে সেজ্‌দা কর্‌তে পারে কিনা? হজরত উত্তরে বলেন, "আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাহাকেও মানুষ সেজ্‌দা করিতে পারে না।

যদি আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত হ’ত তাহ’লে তিনি স্ত্রীদিগকে তাদের স্বামীকে সেজ্‌দা কর্‌তে অনুমতি দিতেন।” আর ব্যবসাদার পীর ফকিরের দল যাঁরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে পথ প্রদর্শনের অধিকারী ব’লে স্পর্দ্ধা করেন তাঁরা শিষ্যদিগকে তাঁদের নিকট নতমস্তক হ’তে দিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না। হিন্দুদিগের মধ্যে যারা প্রকাশ্য পৌত্তলিক তারাও ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব হ’তে স’রে পড়ার চেষ্টা দেখ্‌ছে এবং কেবল ইসলামই মানবদিগের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃভাব আন্‌তে সক্ষম হয়েছে ব’লে মুক্ত কণ্ঠে তারা উহার সাধুবাদ করে। আর এই ব্যবসাদার পীর ও ফকিরের দল তাঁদের শিক্ষা ও ব্যবহার দ্বারা শিষ্যদিগের বিশ্বাস জন্মায়েছেন যে তারা শূদ্র বই নহে এবং তাঁরা দ্বিজ ব্রাহ্মণ। একদিন কেহ কেহ হজরত রছুলে করিমের অত্যধিক মাত্রায় প্রশংসা কর্‌তে থাকে, হজরত বাধা দিয়া বলেন, “এমন কিছু বলোনা যা আমাতে নাই বা আমি যার যোগ্য নহি—নচেৎ অযথা পাপ-ভাগী হবে।” নিজের হউক বা পরের হউক, তিনি প্রশংসাই পছন্দ কর্‌তেন না। একদিন কতকগুলি লোকে এক ব্যক্তির প্রশংসা করায় তিনি বলেছিলেন যে তোমরা তার গলা কর্ত্তন কর্‌লে। বল্‌বার কথাইত, কেননা সুরা এম্‌রানের ১৮৭ আয়েতে আল্লাহ্‌ বলেছেন :—

لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا و يحبون ان يحمدوا بما لم
يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب (ج)

ভাবার্থ—যারা প্রশংসার জন্য লালায়িত তারা কোন প্রকারে শাস্তি হ'তে অব্যাহতি পাবেনা।

কিন্তু এই ব্রাহ্মণ বা তথাকথিত পথপ্রদর্শক পীর ফকিরগণ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন যে তাঁদের এই শূদ্র শিষ্যমণ্ডলী তাঁদিগকে স্তুতিবাদে সপ্তম আকাশে উন্নীত কর্ছে, অথচ তাদের স্তুতিবাদ কর্ণে এরূপ মধুর অমৃত সিঞ্চন করে যে তাঁরা তাতে ফুলে বিভোর হয়ে পড়েন এবং তখন পবিত্র কোরআনের উক্ত নিষেধাজ্ঞা ও হজরত রছুলে করিমের উপদেশ সম্পূর্ণ ভু'লে যান্।

উপসংহারে আমরা বল্‌তে চাই যে মুসলমান একেশ্বরবাদী ব'লে গর্ব্ব করে এবং বলে যে সে দেবতা মানে না, কিন্তু সেকি একদিনের জন্যও ভেবে দেখেছে যে ইসলামের একেশ্বরবাদ কি ? সে ত বলে যে সে দেবতা মানে না, কিন্তু পবিত্র কোর্‌আন কি কেবল মূর্ত্তিকেই দেবতা ব'লে নির্দ্দেশ করেছে? সে জেনে রাখুক যে ইসলামের একেশ্বরবাদ, অতি নিখুঁত ও অতীব উচ্চাঙ্গের একেশ্বরবাদ, অনেক মুসলমানই তার সঠিক ধারণা করতে পারে নাই। সে হয়তো শু'নে আশ্চর্য্যান্বিত হবে যে ঐশী মহাগ্রন্থ কোর্‌আন কুপ্রবৃত্তিগুলিকেও দেবতার অন্তর্ভুক্ত করেছে, এবং পীর, অলি, দরবেশ প্রভৃতির প্রতি অত্যধিক বা অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর্‌লে তাদিগকেও দেবতা শ্রেণীভুক্ত করা হবে, এমনকি যে কোন বস্তুই হোক্ তৎপ্রতি অত্যধিক আসক্তি ও মহব্বৎ প্রদর্শন কর্‌লে তাকেও দেবতা শ্রেণীভুক্ত করা হবে; কেননা একমাত্র তার স্রষ্টা, পালনকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা আল্লাহ্ ব্যতীত কোন জিনিষই মানুষের অত্যধিক মহব্বতের পাত্র হ'তে পারেনা। পবিত্র কোর্‌আনের সুরা

ফোর্‌কানের ৪৩ ও ৪৪ আয়েতে আল্লাহ্ তাঁর হবিব রছুলে করিমকে সম্বোধন ক'রে বল্‌ছেন :—

ارئيت من اتخذ الهه هواه (ط) افانت تكون عليه وكيلا (لا)

ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون (ط) ان هم الا كالانعام

بل هم اضل سبيلا *

"তুমি কি সেই ব্যক্তিকে বিশেষ লক্ষ্য করেছ যে আল্লাহ্‌কে ভুলে তার কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দেবতা জ্ঞানে তাদের তাবেদারী করে? তুমি তাকে ঠেকাবে কিরূপে? তুমি কি মনে কর যে ঐ সকল লোকের অধিকাংশই শুনে বা বুঝে? না, না, তারা পশুবিশেষ, তারা পথ ভুলেছে।" এর চেয়ে পরিষ্কার কথা আর কি হ'তে পারে? কেন, আল্লাহ্ কি ঐশীগ্রন্থ কোর্‌আনের স্থরা জোমরের ৩ আয়েতে স্পষ্টতঃ বলেন নাই যে তাবেদারী কেবল তাঁরই প্রাপ্য? এখানে তাবেদারী কথাটা কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত আবশ্যক, কেননা চাকুরী করাকেও আমরা তাবেদারী করা ব'লে থাকি এবং তাবেদারী করার অর্থ সেবা করাও হয়, এখানে কিন্তু তার অর্থ হচ্ছে ভালমন্দ বিচার না ক'রে সব আজ্ঞাই পালন করা বা সব কথাই মেনে নেওয়া। মানুষ, অন্ততঃ মুসলমান, তা কর্‌তে

পারেনা। এই জন্যই আল্লাহ্ উক্ত ৪৪ আয়েতে ঐ সকল লোককে পশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। অনেক শিষ্যই (মুরিদান) কিন্তু বলেন যে পীর যা বলেন তা বিনা বিচারে মান্তে হবে। এই সকল অবিবেচক মুরিদানকে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়টী বিশেষ ভাবে অনুধাবন করতে অনুরোধ ক'রি:—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দল হজরতের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। আমরা এরূপ চারিটী সময়ের উল্লেখ দেখ্তে পাই—দুইবার দুইদল মদিনাবাসী মক্কায় তাঁর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর মদিনায় হেজরতের (পলায়নের) পূর্ব্বে। এই দুই বারের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া বায়েৎ-উল্-একাবা নামে অভিহিত হয়ে থাকে। তৃতীয়বার হুদাইবেয়া সন্ধির অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁর অনুচরেরা তাঁর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, ইহা বায়েৎ-ই-রেদওয়ান নামে অভিহিত হয়। চতুর্থবার মক্কা বিজয়ের পরে বহু নর নারী যারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা তাঁর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। প্রত্যেক বারেই আল্লাহ্র ইচ্ছায় ও স্থলবিশেষে তাঁর আদেশক্রমে হজরত বয়েৎ গ্রহণ করেছিলেন। সকল সময়ের প্রতিজ্ঞাই প্রায় এক রকমের ছিল, আমরা মক্কাবিজয়ের পরের প্রতিজ্ঞা এস্থলে যথাবথ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি:—আল্লাহ্ সুরা মম্তাহানের ১২ আয়েতে বিশেষ ক'রে বল্ছেন—'হে রছুল, বিশ্বাসিনী স্ত্রীলোকেরা তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে আস্লে তুমি তাদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করো ও তাদের জন্য আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তারা প্রতিজ্ঞা করবে যে তারা কাহাকেও আল্লাহ্র অংশীদার কর্বে না, চুরি কর্বে না, ব্যভিচার কর্বে না, সন্তানকে মেরে ফেল্বে না, কাহারও কুৎসা কর্বে না, এবং সৎকাজে ও সত্য বিষয়ে তোমার অবাধ্যতা

করবে না।" হুদাইবেয়ার প্রতিজ্ঞার বেলা আল্লাহ্ তাঁর রছুলকে বলেছেন যে তারা তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করে নাই, তারা আমার নিকটই প্রতিজ্ঞা করেছে, তাদের হাতের উপর আমার হাত ছিল। এক্ষণে নিষ্পাপ আল্লাহ্‌র রছুল যাঁর সম্বন্ধে তিনি বললেন যে তাঁর নিকট ও আল্লাহ্‌র নিকট প্রতিজ্ঞা একই কথা, তাঁর বেলা প্রতিজ্ঞার সর্ত্ত হ'ল সৎকাজ ও সত্য বিষয়ে তাঁর অনুগমন করার, আর এই মুরিদানেরা অনুসরণ করবেন ঘোর সংসারী ব্যবসাদার পীরের বিনা বিচারে। ব্রাহ্মণ শূদ্রকে দাস করেছে ও পীর মুরিদানকে দাস করেছে। কি ভীষণ অধঃপতন! বর্ত্তমানের মুসলমানের কি জঘন্য বিবেক-হীন মানবে পরিণতি!! এখানে তাবেদারী অর্থে চাকুরীর কথাটাও সুস্পষ্ট ক'রে ব'লে দেওয়া ভাল। ভৃত্যকে প্রভুর আজ্ঞা মানতে হয়, অন্যথা চাকুরী থাকে না। কিন্তু এই সকল প্রভু সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'তে পারেন না, ভৃত্য তাঁদের আজ্ঞার বিচার করতে পারে, এবং ইহারা ততক্ষণ প্রভু যতক্ষণ চাকুরী। এখানেই এসমস্ত প্রভুর সহিত মহাপ্রভুর প্রভেদ। মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র আদেশের বিরুদ্ধে এঁদের আদেশ টিকতে পারেনা, যেমন দুনিয়ার কোন প্রভু নামাজের জন্য অতিরিক্ত সময়ে কাজ করায়ে নিতে পারেন কিন্তু নামাজ পড়তে নিষেধ করতে পারেন না। যদি তিনি তা করেন, তাহ'লে ভৃত্য যদি প্রকৃতই আল্লাহ্‌র তাবেদার হয় তবে সে এই অবিবেচক প্রভুর আদেশ অমান্য করতে বাধ্য। যে আল্লাহ্‌র প্রকৃত তাবেদার সে আল্লাহ্‌কেই একমাত্র অন্নদাতা মনে করে। এখানে নিম্নলিখিত বিষয়টী আমাদের বিশেষভাবে মনে

রাখ্‌তে হবে। সুরা জোমরের ৩ আয়েতে আল্লাহ্‌ হজরত রছুলে করিমকে আদেশ করেছেন ব'লে সেখানে তাঁকে আদেশ করা হয়েছে কেবল আল্লাহ্‌রই তাবেদারী করতে, কিন্তু যে যে স্থলে, যেমন সুরা এম্‌রানের ৩০ আয়েতে, রছুলে করিমের মা'ফতে বান্দাদিগকে আদেশ করা হয়েছে, সেই সব স্থলে তাদিগকে আদেশ করা হয়েছে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রছুলের তাবেদারী করতে। সুরা নেছার ৮০ আয়েতে আল্লাহ্‌ বল্‌ছেন :—

مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ *

"যে রছুলের তাবেদারী করে সে আল্লাহ্‌রই তাবেদারী করে"। তাহলে ইহা প্রতিপন্ন হ'ল যে মুসলমানকে কেবল আল্লাহ্‌ ও তাঁর রছুলের আদেশ বিনা বিচারে মান্‌তে হবে, কেননা রছুল যা বলেন তা আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ পেয়েই বলেন সুতরাং তাঁর আদেশ ভ্রমশূন্য, অপর কাহারও আদেশ তা তিনি যেই হউন, মুসলমান বিনা বিচারে মান্‌তে বাধ্য নয়।

পবিত্র কোর্‌আনের সুরা তওবার ৩১ আয়েতে আল্লাহ্‌ বল্‌ছেন :—

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ *

"তারা (ইহুদী ও খৃষ্টানেরা) তাদের ধর্ম্মযাজক ও সাধু মহাপুরুষদিগকে (দেবতার আসনে বসায়েছে) আল্লাহ্‌ ব'লে গ্রহণ

করেছে"; কেননা, তারা উহাদেরই তাবেদারী করে অর্থাৎ উহাদের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ও বিনা বিচারে উহাদের আদেশ পালন করে। ভাল, সাধু মহাপুরুষ ও ধর্ম্মযাজকদিগকে দেবতার আসনে আসীন করার নিমিত্ত যদি ইহুদী ও খৃষ্টানেরা অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তবে পীর, অলি প্রভৃতির প্রতি তদ্রূপ আচরণ ক'রে মুসলমান কিরূপে শাস্তির হাত হ'তে অব্যাহতি পাওয়ার আশা করতে পারে তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। না, কেবল ইহুদী ও খৃষ্টানকেই সতর্ক ক'রে দেওয়া হয় নাই, আল্লাহ্ সুরা এম্‌রানের ৬৪ আয়েতে সকল মানুষকেই আদেশ দিয়াছেন এই ব'লে—"বল, আল্লাহ্ ব্যতীত আমাদের মধ্যের কাহাকেও আমরা প্রভু ও পথ প্রদর্শক রূপে গ্রহণ করিনা।" মুসলমান, এখনও সাবধান হও, তওবা কর। ইহাই, আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্যই, তোমাদের অবনতির হেতু।

ঐশী মহাগ্রন্থ কোর্‌আনের সুরা ইউসুফের ১০৬ আয়েতে বলা হয়েছে :—

وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون *

"তাদের অধিকাংশই (তারা বলে বটে আল্লাহ্‌ই একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ও অদ্বিতীয় কিন্তু) আল্লাহে বিশ্বাসী নহে, তারা অংশীবাদী"। কি ভয়ঙ্কর কথা! ইহা শুনলে কার না মনে আতঙ্কের উদ্রেক হয়? ইহার অব্যবহিত উপরের আয়েতের সহিত ইহা পাঠ করলে ইহার

অর্থ অতি সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। সমস্তের ভাবার্থ এই যে আকাশ ও ভূমণ্ডলে সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ্‌র অলৌকিক সৃষ্টি-কৌশল ও তাঁর অদ্বিতীয়ত্বের অনেক নিদর্শন আছে যা তারা অহরহ দেখ্‌ছে এবং যদ্দ্বারা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তারা মুখে বল্‌তে বাধ্য হচ্ছে যে আল্লাহ্‌ই একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, অদ্বিতীয় ও একমাত্র উপাস্য, কিন্তু তাদের মন ভিজেও ভিজেনা।

আল্লাহ্‌ যখন তখন বলেছেন যে যা কেবল তাঁরই প্রাপ্য তাতে অন্যকে শরীক করোনা।

উপরিউক্ত আয়েত সকল হ'তে বেশ বুঝ্‌তে পারা গেল যে ইসলামের একেশ্বরবাদের স্বরূপ কি।

আল্লাহ্‌র স্বরূপ কি তাহাও মুসলমানের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। অংশীবাদ ও অবতার-বাদের সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়া আল্লাহ্‌ সুরা শো-'আরার ১১ আয়েতে আপনার স্বরূপ কি সুন্দর রূপেই না বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন:—

ليس كمثله شئ

"কিছুই তাঁর অনুরূপের মত নহে" অর্থাৎ তাঁর অনুরূপের ধারণা করা অসম্ভব, এমনকি, রূপক দ্বারাও তা সম্ভব নহে যেহেতু তিনি নিরাকার; কেননা, তিনি বলেছেন যে কিছুই তাঁর অনুরূপ তো নহেই, অনুরূপের মতও নহে। বাস্তবিক, পবিত্র কোর্‌আনের প্রদত্ত আল্লাহ্‌র ধারণা কি উচ্চাঙ্গের তাহা চিন্তার বিষয়। ইসলামে আল্লাহ্‌র

স্বরূপের ধারণা যেমন অতি উচ্চাঙ্গের, একেশ্বরবাদের ধারণাও তেমনি অতি উচ্চাঙ্গের। কেবল তাঁর গুণের অনুধ্যানই তাঁর স্বরূপের ধারণা 'জন্মা'তে পারে।

আমরা এক্ষণে সাধারণ পীর ও ফকির এবং সাধারণ মুরিদান সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ কর্‌ছি।

সাধারণ ফকিরেরা নজির দেখায় কামেল দরবেশের। তারা বলে যে উঁহারা যখন শরিয়তের পায়াবন্দ নহেন তখন তারা শরিয়তের পায়াবন্দ হ'তে যাবে কেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপে তারা বলে যে হজরত মহর্ষী মনসুর "আনাল্‌হক্‌" বল্‌তেন, তজ্জন্য তাকে কতল্ (হত্যা) করা হয়। প্রবাদ আছে যে তাঁর মৃতদেহ ভস্মীভূত ক'রে দরিয়ায় ফেলে দিলেও সেই ভস্মরাশি হ'তে 'আনাল হক্‌' শব্দ উত্থিত হতেছিল। শরিয়তের গোলামেরা তখন বুঝ্‌ল যে বাস্তবিক হজরত মহর্ষী মনসুর কত বড় মহাপুরুষ ছিলেন। এইরূপ বাদশাহী আমলের কাজী সানাউল্লাহ্‌ সাহেব হজরত বু'আলি কলন্দর নামে এক মহা তাপসের লম্বা গোঁপের বিষয় জান্‌তে পেরে, এবং তিনি নামাজের রীতিমত পায়াবন্দ নহেন শু'নে একে একে স্বীয় কয়েক পুত্রকে সেই তাপস সমীপে প্রেরণ করেন বলপূর্ব্বক তাঁর গোঁপ কর্ত্তন করতে, কিন্তু তাঁর কোন পুত্রই এ কাজে সিদ্ধ-মনোরথ হ'তে পারেন নাই, তাপস প্রবর তাঁদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মাত্রই তাঁরা একে একে মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে ভূতলশায়ী হলেন। কাজী নিরস্ত হওয়ার পাত্র ছিলেন না, তিনি শেষে স্বয়ং এ কাজের জন্য অগ্রসর হলেন এবং বলপূর্ব্বক তাপস মহাপুরুষকে ভূপাতিত ক'রে তাঁর গোঁপ কর্ত্তন ক'রে দিলেন। প্রবাদ আছে যে তাঁর

কর্ত্তিত গোঁপ হ'তে রক্ত টপ্‌কিয়ে পড়্‌ছিল ও তাহাতে 'আল্লাহ্‌' শব্দ হচ্ছিল। শরিয়তের গোলামেরা ত দেখে অবাক। তাপসপ্রবর গম্ভীর ভাবে কাজীকে বল্‌লেন যে তোমার কাজত তুমি কর্‌লে, এবার আমার কাজও আমি করি এই ব'লে তিনি কাজীর মৃত পুত্রদিগকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন বৎসগণ, আল্লাহ্‌র মর্জ্জিতে উঠে বস, আর ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গেই কাজীর মৃত পুত্রগণ উঠে বস্‌ল। দেখ্‌লে ফকিরীর মাহাত্ম্য? কিন্তু লোকে দেখেও দেখেনা, বুঝেও বুঝেনা। শরিয়তের গোলামেরা কেবল নামাজ নামাজ ক'রে মরে কিন্তু তাদের নামাজ পড়া যে পণ্ডশ্রম তাকি তারা বুঝে? 'হুজুরে কল্‌ব্‌' না হ'তে পার্‌লে যে নামাজ কবুল হয় না, মেহনৎ বরবাদ যায় তাকি মুর্খেরা জানে? একদিন বাদশাহ্‌ আলমগীর শাহ্‌ সারমদ নামে এক দরবেশের সম্বন্ধে শুনতে পান যে ঐ ব্যক্তি নামাজ পড়েন না, বাদশাহ্‌ তাঁকে তলব কর্‌লেন এবং জিজ্ঞাসা কর্‌লেন আপনি নামাজ পড়্‌বেন না? দরবেশ উত্তর দিলেন যে নিশ্চয় তিনি নামাজ পড়্‌বেন। সেই দিনকার নামাজে তাঁকে সামিল হওয়ার আদেশ করা হ'ল। দরবেশপ্রবর নামাজের জন্য উপস্থিত হলেন, বাদশাহ্‌ও নামাজে সামিল হয়ে জানতে পারিলেন যে দরবেশ এসেছেন। এমাম যেই প্রথমে তকবিরে তহ্‌রিমা "আল্লাহো আক্‌বর" উচ্চারণ কর্‌লেন, অমনি দরবেশপ্রবর বল্‌লেন যে তোমার "আল্লাহো আকবর" আমার পদতলে এবং এই ব'লে তিনি প্রস্থান কর্‌লেন। নামাজান্তে একথা বাদশাহের কর্ণগোচর হলে তিনি পুনঃ দরবেশকে তলব কর্‌লেন, এবং জিজ্ঞাসা কর্‌লেন যে তিনি ঐরূপ গর্হিত কথা বলেছেন কিনা এবং ব'লে থাক্‌লে কেন বলেছেন? দরবেশ

প্রবর স্বীকার করলেন যে ঐ কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু এই ব'লেই নিস্তব্ধ হলেন। বাদশাহের আদেশে দরবেশের মুণ্ডচ্ছেদ করা হ'ল। বাদশাহের কিন্তু এই ঘটনার পরে বড় অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগল; তাঁর ভালমত আহার ও নিদ্রা হয় না। একরাত্রে বাদশাহ্ স্বপ্নে দেখলেন যে হজরত রছুলে করিম আগে আগে যাচ্ছেন, তারপরে সেই দরবেশ মুণ্ডহস্তে ও তৎপশ্চাতে স্বয়ং বাদশাহ্ এবং দরবেশ হজরতকে বল্‌ছেন যে এই আলমগীর বাদশাহই তার মুণ্ডচ্ছেদন করেছেন। ইহাতে হজরত পশ্চাদ্দিকে ফিরে বললেন "বাদশাহের নহে আমার তরবারির দ্বারাই তোমার মুণ্ডচ্ছেদ হয়েছে"। বাদশাহ্ আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু দরবেশ যে একজন আল্লাহ্‌গতপ্রাণ মহাপুরুষ ও হজরতের অনুগত প্রিয়-পাত্র তা তিনি বেশ বুঝতে পারলেন। দরবেশের নামাজের সময়ের ঐরূপ উক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য বাদশাহ্ ব্যস্ত হলেন এবং এমামকে তলব করলেন। বাদশাহ্ অভয় দান ক'রে এমামকে সেই দিনকার নামাজ আরম্ভকালে তাঁর মনের ভাব কিরূপ ছিল তা নির্ভয়ে ব্যক্ত করতে বললেন। এমাম বললেন যে তখন আমার মনে হয়েছিল আমার মেয়ের বিবাহের কথা এবং আমার অস্বচ্ছল অবস্থার কথা; আমি তাই আপনার বক্‌শিশের আশায় আপনাকে সন্তুষ্ট করার মানসে কেরাত ভাল ক'রে পড়েছিলাম। বাদশাহ্ উহা শু'নে দরবেশ নামাজের সময় কোন্ স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা স্থির করতঃ ঐ স্থান খনন করার আদেশ দিলেন। দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে ঐ স্থানের নীচে প্রচুর ধন দৌলত প্রোথিত রয়েছে। দরবেশপ্রবর নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে ঐ এমামের এমামতিতে নামাজ কবুল হবেনা, কেননা সে হুজুরে

কল্‌ব্‌ হ'তে পারে নাই। ফকিরীর ভেদ কয়টা লোকে বুঝে এবং ফকিরের কার্য্যের রহস্য যে গুপ্ত থাকে তা কয়টা লোকে জানে? অথচ ফকিরের নিন্দায় লোকে পঞ্চ-মুখ।

এই প্রকারের যত ভণিতা ফকির সাহেবদের। এরা আসল কাজের কাজী নহে, আসল বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে না, করতে চায় না এবং করতে পারে না। এরা এই প্রকারের আত্ম প্রবঞ্চনা ক'রে জগত্‌কে প্রতারিত করতে চায়, আত্মার সহিত ফাঁকিবাজী ক'রে বিবেককে ধাপ্পা দিতে চায়। এরা কি একবারও বুঝ্‌তে চেষ্টা করে যে হজরত মহর্ষী মনসুর, হজরত বায়জিদ বোস্তানী প্রভৃতির মত মহাতাপসেরা কি উপায়ে কামেল হয়েছিলেন? এবং এরা কি বাস্তবিকই তাঁদের পন্থা অবলম্বন করেছে বা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চল্‌ছে? তাঁরা কি কঠোর সাধনাই না করেছেন? ভাল, মহাতপা সিদ্ধ মহাপুরুষেরা যাঁদের নজির এরা প্রদর্শন করে, তাঁরা কি শরিয়তের পায়াবন্দী করেই সিদ্ধিলাভ করেন নাই? তাঁরা সকলেই ত সত্যবাদী, জীতেন্দ্রিয় ও মহাজ্ঞানী ছিলেন, এরা সেরূপ হওয়ার কোন ভাব বা তদ্রূপ হওয়ার চেষ্টার কোন নিদর্শন এ পর্য্যন্ত এদের জীবনে প্রদর্শন করতে পেরেছে কি? এরা নিজে চুনোপুঁটী কিন্তু চাল দেয় এরা রোহিত কাতলার। এরা যে চুনোপুঁটী তা এরা একবারও ভাবে না, নিজের প্রকৃত অবস্থার দিকে এরা একেবারেই খেয়াল করে না। এই প্রকারের চালবাজী দ্বারা যে এরা উভয় কুল নষ্ট ক'রে বুদ্ধিমান লোকের নিকট না-ঘরের—না-ঘাটের জিনিষ ব'লে নিজকে প্রতিপন্ন করে, তা এরা মোটেই বুঝ্‌তে চায় না।

দুঃখের বিষয় যে নিরেট মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য, বাপ-তাড়ান, মা-খেদান লোকগুলাও ফকির সেজে বসে। এই রকমের ফকিরের সংখ্যাই অত্যধিক। এরা ফকিরীরূপ ভাল জিনিষটাকেও লোকের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করায়। এদের উৎপাত দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এরা হয়ে দাঁড়া'য়েছে সমাজ দেহে দুষ্ট ব্রণ বিশেষ। কত নিরীহ লোক যে এদের কুহকে প'ড়ে গোমরাহ্ হয়ে যাচ্ছে কে তার সংখ্যা করে। সমাজের পক্ষে আর চুপ থাকা অসমীচীন হবে, এদের উপরে এখন হ'তে সমাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়েছে।

আমরা শুন্‌তে পেলাম যে এক নূতন পীর অল্পদিন হ'ল অত্র জেলায় আত্ম-প্রকাশ করেছেন। ইনি ফতওয়া জারী করেছেন যে, যে জমিতে তামাক উৎপন্ন করা হয়, তাতে বার (১২) বৎসর অন্য ফসল জন্মালে সে সমস্ত ফসলই হারাম হবে। এই অর্ব্বাচীনের এই আজগুবি উক্তির প্রতিবাদ কল্লে সেদিন না কি এক ওয়াজের সভা হয়ে গেছে। এই অর্ব্বাচীনদের বেশ জানা আছে যে নাম জাঁকাতে হলে নূতন কিছু একটা শুনাতে হবে তা উহা যতই আজগুবী ও গুলীখোরী হোক্‌না কেন, কেননা এরূপ না করলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না। এই পীর সাহেব নাকি জ্বীনকেও মুরিদ করেন। আরও শুন্‌তে পাওয়া গেছে যে একজন পীর না ফকির ব'লে বেড়াচ্ছেন যে কোর্‌আন শরীফ সর্ব্বসাকুল্যে ৪০ পারা, তন্মধ্যে ৩০ পারা সাধারণে প্রকাশিত ও অবশিষ্ট ১০ পারা পীর ফকিরদের অন্তরে অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। আমরা মনে করি যে এই অপদার্থ জীবগুলির উক্তির প্রতিবাদ কর্‌তে যে'য়ে আলেম সাহেবেরা এদেরকে

নামজাদা করেই তুলেন মাত্র। আমাদের মতে সমাজের উচিত হচ্ছে এদের নিকট এদের উক্তির বিশ্বাস যোগ্য দলিল তলব করা এবং এরা তা উপস্থিত কর্‌তে না পার্‌লে এদের সম্বন্ধে সাধারণকে সতর্ক ক'রে দেওয়া। সাধারণ লোক শিক্ষিত নয় ব'লেই এই অর্ব্বাচীনের দল তাদিগকে ঠকাবার সুযোগ পেয়েছে। এই মতলববাজ পীর ফকীরের দল তাদের স্বার্থের হানি হবে ব'লে তারা সাধারণ শিক্ষার বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী।

সাধারণ মুরিদানের অধিকাংশই অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত। মুরিদানের মধ্যে এইরূপ লোকের সংখ্যাই অত্যধিক এবং ইহারাই হচ্ছে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য অর্থ-লোভী স্বার্থপর সাধারণ পীরদিগের হাতের পুতুল বিশেষ। এরা না কর্‌তে পারে এমন কাজ নাই। দল সৃষ্টি কর্‌তে এরা মজবুত, ঝগড়া বাধাতে মজবুত, সঙ্কীর্ণতা এদের মজ্জাগত। মত-সহিষ্ণুতা এদের মধ্যে আদৌ নাই, অন্যের ভাল জিনিষের এরা সাধুবাদ কর্‌তে জানেনা, কেননা এরা বিচার-শক্তিহীন। এরা সুশিক্ষার প্রসারের বিরোধী ও সাবেক ধরণের মক্তব শিক্ষার পক্ষপাতী। এদের শিক্ষা ও প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় বিস্তার লাভ করেছে এদের এই সমস্ত মুরিদানের মধ্যে, এদের কথা এ সমস্ত মুরিদানের নিকট বেদবাক্য। পল্লীগ্রাম তাই শান্তির স্থলে অশান্তির আগার হয়ে দাঁড়া'য়েছে, তাই মুসলমানের মধ্যে শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার হ'তে পার্‌ছে না। এই সকল মুরিদানের স্বাধীন মত নাই, গ্রামের সর্দ্দার মুরিদান যা বলে তাই তারা নত শীরে মেনে নেয়। এই সমস্ত অনভিজ্ঞ মুরিদান এমন সমস্ত বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করে যা মুসলমানী আক্কিদার বিরোধী।

এদের অন্তঃকরণ কুসংস্কারে ভরা। অনেকের বিশ্বাস এই যে শরিয়তের সম্যক্ পায়াবন্দী না কর্‌লেও তাদের বিশেষ ক্ষতি হবে না, তাই তারা মুরিদ হয়ে এক রকম নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে, হুজুর পীর সাহেব কেবলার উপর নির্ভর ক'রে।

অজ্ঞ মুসলমানের দৈব ব'লে একটা মস্ত ভুল ধারণা আছে। তারা গল্পে শুনেছে যে হঠাৎ একদিন এক মাতাল এক কামেল ফকিরের সংস্পর্শে এসে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিল। এই প্রকারের অনেক গল্পই তারা শুনেছে এবং তাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে এগুলো নিছক দৈবসংযোগ এবং হয়ত তাদেরও এরূপ সংযোগ উপস্থিত হ'তে পারে। তারা কারণ আদৌ অনুসন্ধান কর্‌তে চায় না যেহেতু কারণ পরম্পরায় যে কার্য্যের উৎপত্তি হয় সে জ্ঞান তাদের নাই। আল্লাহ্ তাঁর মহাগ্রন্থ কোর্‌আনের সুরা দোখানের ৩৮ আয়েতে বল্‌ছেন যে তাঁর কোন কাজই খামখেয়ালীর নহে, প্রত্যেকটার কারণ আছে এবং প্রত্যেকটা কোন না কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সংঘটিত হয়। আল্লাহ্ হঠাৎ উক্ত মাতালকে কেন দিব্যজ্ঞান দিলেন তার কারণটাও একবার খুঁজে দেখা যাউক। আমরাও সেই মাতালের গল্প শুনেছি। মাতালের বাসস্থানের অনতিদূরে এক সাধক মহাপুরুষ তপস্যা-নিরত ছিলেন। কখন কখনও দুই একজন মোক্ষকামী ব্যক্তি তাঁর নিকট মুরিদ হ'তে আস্‌ত। মাতালেরও একদিন মনে হ'ল যে, সে যে তার জীবন বরবাদ্ করেছে তাই এই সাধু মহাপুরুষের কাছে মুরিদ হ'তে পার্‌লে ভাল হ'ত। ক্রমেই এই ভাবটা প্রবল আকার ধারণ ক'রে তাকে অস্থির ক'রে তুল্‌ল, কিন্তু কেবলই তার ভয় হয়, কি

ক'রে সে সাধু মহাপুরুষের নিকট যাবে, তিনি যে তাকে মাতাল ব'লে জানেন। তবেইত তার আর আল্লাহ্ প্রাপ্তি হয় না—সে এই কথা ভাবে আর অশ্রুজলে বুক ভাসায়। অবস্থা এরূপ হ'ল যে আহার নিদ্রা বন্ধ, কেবলই হাহুতাশ, কেবলই ক্রন্দন। ইতিমধ্যে সে দুই চারিবার সাধু মহাপুরুষের নিকট যাবে মনে ক'রে রওয়ানা হয়েছিল কিন্তু ভয়ে রাস্তা হ'তে ফিরে এসেছে। আল্লাহ্ যিনি "আলিমুম্ বেজাতেস্ সত্থর" অর্থাৎ যিনি সকলের অন্তঃকরণের হাল বা আসল কথা জানেন তাঁর আসন কেঁপে উঠ্‌ল, তিনি কি আর স্থির থাকতে পারেন। তিনি তখনই তার উদ্ধারের ব্যবস্থা কর্‌লেন। তিনি তার মনে প্রেরণা দিলেন যে আর একবার তাপসের নিকট যাও এবং তাপসের মনে প্রেরণা দিলেন যে মাতালকে অভয় দিয়ে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে তাকে মুরিদ কর। তাই মাতালের কামেল ফকিরের সংস্পর্শে দিব্যজ্ঞান-লাভ। আমাদের ভুলে গেলে চল্‌বে কেন যে আল্লাহ্ বলেছেন যে তোমরা যেমন গুনাহ্ই করনা কেন তওবা ক'রে অন্তরের সহিত অনুতপ্ত হয়ে অকপটে দোষ স্বীকার কর এবং সরলান্তঃকরণে কাতরতার সহিত ক্ষমা প্রার্থী হও, ইচ্ছা হ'লে আমি ক্ষমা কর্‌ব, তোমাদের কামনা সিদ্ধ হবে। তিনি বলেছেন "ওয়াস্তাগ্ ফেরুল্লাহ্ ইন্নাল্লাহা গফুরর্ রহিম"। তাই বলি দৈব কিছু নহে, সবই করুণাময় বিশ্বপতি আল্লাহ্‌র ইঙ্গিত বা কার্য্য। দুনিয়াবী ঘটনার একটা দৃষ্টান্ত দিয়েই না হয় বিষয়টা পরিস্ফুট করা যাক্। এক উচ্ছৃঙ্খল প্রজা খাজনা দেওয়ার নাম করেনা, পাইক বরকন্দাজ পাঠালে সে আসেনা। জমিদার ত্যক্ত বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়ে তাকে উচ্ছেদ করেন এবং

আদালতের সাহায্যে তাকে উঠে যাওয়ার নোটিশ দেন। বলা বাহুল্য যে ভিটা বাড়ী ব্যতীত তার আর কিছুই ছিলনা। সে এখন ফাঁপরে পড়্‌ল, বাড়ী ছেড়ে স্ত্রী সন্তান নিয়ে সে এখন গাছতলায় কি ক'রে থাকে। সে ভাব্‌ল যে জমির মালিক জমিদার ছাড়া কে এখন তাকে এই বিপদ হ'তে উদ্ধার করে? কাজেই গত্যন্তর রহিত হয়ে সে শেষে জমিদারেরই শরণাপন্ন হ'ল। সে কেঁদে জমিদারের চরণতলে পতিত হ'ল। জমিদার তাকে 'দূর হও' ব'লে তাড়ালেন কিন্তু সে আর উঠেনা। জমিদার বল্‌লেন খাজানা দেওনা যে? সে বল্‌ল হুজুর, টাকা কি হাতে আছে যে খাজানা দিব? জমিদার পুঃন বল্‌লেন, ডাক্‌লে আসনা যে? তাতে সে উত্তর দিল, খালি হাতে এসে কি হবে, তাতে যে আপনার ক্রোধই বাড়্‌বে। জমিদার বল্‌লেন বটে, তবে এখন খালি হাতে এলে যে? সে বল্‌ল, কি করি হুজুর, স্ত্রী সন্তান নিয়ে যে বাড়ী ছেড়ে যেতে হচ্ছে, আপনি রক্ষা না কর্‌লে স্ত্রী সন্তান নিয়ে কি ক'রে বাঁচ্‌ব? আপনি রক্ষা কর্ত্তা, আপনাকে দয়া কর্‌তেই হবে। জমিদার বল্‌লেন যা, দয়া টয়া হবেনা। তার মুখে আর কথা নাই, সে প'ড়ে প'ড়ে কেবল কাঁদে। জমিদার-গৃহিনী অন্তরাল হ'তে আদ্যোপান্ত সবই শুন্‌লেন, শুনে সম্মুখে এসে বল্‌লেন, ঈশ্বরেচ্ছায় তোমার অভাব কিসের? একটা গরীব না হয় নাই কিছু দিল। জমিদার বিরক্ত হয়ে সেস্থান হ'তে চলে গেলেন। দুই তিন ঘণ্টা পরে ফিরে এসে দেখেন যে লোকটা ঐ ভাবেই প'ড়ে প'ড়ে কাঁদছে। বল্‌লেন প'ড়ে থাকলে কিছু হবেনা। লোকটা আরও আকুল ভাবে কেঁদে বল্‌ল, যদি আপনার দয়া না হয় এখানেই

না খে'য়ে মরব। গৃহিনী আবার এসে বল্‌লেন যদি তোমার দয়া না হয় আমিও ওর সঙ্গে খাওয়া বন্ধ কর্‌লাম। জমিদারের মনটা আগে থেকেই কেমন কেমন কর্‌ছিল, এখন দেখ্‌লেন যে সকলেই যেন ঐ লোকটার প্রতি স্নেহশীল হয়েছে। তিনি আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লেন না, বল্‌লেন গৃহিনী, লোকটা কিছুই খায় নাই, ওকে কিছু খাবার এনে দাও এবং ওর সন্তানাদির জন্যেও কিছু খাবার ওর সঙ্গে দাও। আর লোকটাকে বল্‌লেন আমি তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করলাম, আমি এখনই হুকুম দিব আর কেহই তোমাদেরকে বাড়ী হ'তে তাড়াবে না। নির্ব্বোধ মানুষ, আল্লাহ্‌কে ভুলে দুনিয়ার জমিদারকে মালিক ভেবে এই ভাবে ধর্‌লে যদি তিনিও সাতখুন মাফ্‌ দেন, তবে দয়া ও ক্ষমার আধার রহ্‌মানুর্‌-রহিম, সকল মালিকের মালিক আল্লাহ্‌কে সেই ভাবে ধর্‌তে পার্‌লে মানুষের কি কোনও বিপদ, কোনও অভাব অনটন থাকে? তার খাজানা দেওয়ার অক্ষমতাও দূর হয়ে যায়। যারা দৈব দৈব করে তারা এই মাতাল হ'তে শিক্ষা করুক, কেমন ক'রে আল্লাহ্‌কে ধর্‌লে মানুষের সব কাজ হাসিল হ'তে পারে। সাধারণ পীরদিগের চাল উল্‌টা। এদের উল্টা চাল দেখেই সকলে এদিগকে সহজেই চিনে ফেল্‌তে পার্‌বেন। নিয়ম হচ্ছে যে লোকে আল্লাহ্‌র পথে অগ্রসর হ'তে যেয়ে দিশা না পেয়ে তখন প্রাণের আবেগে পীরের তল্লাস কর্‌বে কিন্তু এই অর্থলোভী পীরেরা নিজেরাই মুরিদান তল্লাস করে। অনেকেই পড়েছেন ও শুনেছেন যে অনেক মোক্ষকামী ব্যক্তি ভাল পীর বা আসল পীরের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন অর্থাৎ ঐসকল লোককে তাঁরা মুরিদ করেন

নাই এই হেতু যে তাঁরা তখনও স্বীয় চেষ্টাবলে মুরিদ হওয়ার উপযুক্ত হ'তে পারে নাই। অনেক কামেল দরবেশকেও প্রথমাবস্থায় ফেরত আস্‌তে হয়েছে। আমরা এস্থলে এমন একজন সুপ্রসিদ্ধ কামেল দরবেশের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর্‌ছি যিনি পাঠকের সুপরিচিত ও সকলেরই ভক্তির পাত্র। ইঁহার নাম হজরত মাইনুদ্দীন চিস্তি। ইঁনি ১৫ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। পিতৃত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে একটী বাগান ছিল। একদা তিনি বাগানে পানি দিচ্ছিলেন এমন সময় তদঞ্চলবাসী আল্লাহ্‌-প্রেম-পাগল (মজ্জুবুল্‌ হাল) হজরত ইব্রাহিম কান্দোজী তৎসমীপে উপনীত হ'লে বালক মাইনুদ্দীন কয়েকটা বেদানা তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হয়ে কান্দোজী স্বীয় ঝোলা হ'তে খৈলের মত এক জিনিষ তাঁকে খাওয়াইয়া দেন, যাতে বালক সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ ক'রে বালক মাইনুদ্দীন দেখেন যে ফকীর সেখানে নাই। ফকীরের ঔষধ সেবন ক'রে তাঁর মনের ভাব এমন পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছিল যে তিনি বাগানটী আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দান ক'রে কামেল পীরের অনুসন্ধানে বহির্গত হয়েন এবং কিছুকাল অনুসন্ধানের পর একদিন সিদ্ধ মহাপরুষ হজরত ওসমান হারুণীর (রাজিঃ) খেদমতে হাজির হলেন। হজরত ওসমান হারুণী কিন্তু তাঁহাকে গ্রহণ কর্‌লেন না, বল্‌লেন, যাও আগে ইল্‌ম্‌ শিক্ষা ক'রে উপযুক্ত হও। অতঃপর বালক মাইনুদ্দীন ত্রিশবৎসর বিদ্যা শিক্ষা ক'রে পুনঃ তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হ'লে তিনি তাঁকে সাগ্রহে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে যথোচিত ভাবে খোদাতত্ত্ব শিক্ষা দেন।

হজরত সেখ সাদী রহ্‌মতুল্লাহ বলেছেন ঃ—

”چو شمع از پی علم باید گداخت

که بے علم نتوان خدا را شناخت“

"ইল্‌মের তরে দগ্ধ হও মোমবাতি সম,

বিদ্যাহীন আল্লাহকে চিনিতে অক্ষম।"

মোমবাতি যেমন দগ্ধ হয়ে, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনি জীবন ক্ষয় ক'রে বিদ্যার্জ্জন কর্‌তে হবে ; কেননা. বিদ্যা ব্যতীত আল্লাহ্‌কে চিন্‌তে পারা যায় না। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে এই সকল সাধারণ পীর ফকির যেন 'ভুঁইফোড়' অর্থাৎ এরা যেন পীর ও ফকির হয়েই ভূমিষ্ঠ হয়। আরও দুঃখের বিষয় এই যে এরা এতই অর্থলোভী ও স্বার্থপর যে এরা কেবল মুরিদানের তল্লাসে ফিরে এবং শিশু হও আর প্রাপ্ত বয়স্ক হও, সুদ খোর হও আর বেনামাজী হও, যেই হও এরা তৎক্ষণাৎ তাদিগকে সাগ্রহ মুরিদ ক'রে ফেল্‌বে। এই সকল অর্থগৃধ্নু পীর হ'তে সকলের সাবধান হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌র পথে অগ্রসর না হয়ে পীর তল্লাস করায় কোন ফল নাই এবং তা উচিতও নহে। পীর ধর্‌তে হলে ঐ রকম পীর ধর্‌তে হবে যাঁর মধ্যে এই পুস্তকে বর্ণিত হজরত শাহ্‌ অলিউল্লাহ্‌ সাহেব নির্দ্দেশিত পাঁচটী গুণ বিদ্যমান আছে। বিশেষ ক'রে বিষয়-লিপ্সা যাঁর এখনও যায় নাই, তিনি কোন ক্রমেই পীরের যোগ্য নহেন।

এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারিনা কি যে **সাধারণ অযোগ্য লোকের মুরিদ হওয়ার এমন কি আবশ্যকতা আছে?** কেননা মুরিদ হওয়ার নিমিত্ত তৎপূর্ব্বে

নিজকে তদুপযুক্ত করার নিমিত্ত যথেষ্ট আত্মচেষ্টা ( Preparation ) একান্ত আবশ্যক। **অবশ্য শরিয়ৎ অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হজ্জ্, জাকাৎ প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য-বিষয়, কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে সাধারণ লোক ত যথেষ্ট উপদেশ পেয়ে থাকে দেশের মৌলবী, মুনশী প্রভৃতির নিকট।** বাস্তবিক, এই মৌলবী ও মুন্‌শী সাহেবান যে দেশের অনেক উপকার সাধন করেন, তাতে মতদ্বৈধ থাকতে পারেনা। বস্তুতঃই তাঁরা সমাজের ধন্যবাদার্হ। **তবেইত সাধারণ লোকের পীরান্বেষণের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।** অপরন্তু আল্লাহ্ বলছেন :—

بلی ـ من اسلم وجهه لله و هو محسن ...... و لا خوف
عليهم و لا هم يحزنون *

—সুরা বকরের ১১২ আয়েত।

আল্লাহ্ এই আয়েতে স্বর্গপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন—"যে ব্যক্তি আল্লাহে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে ও সৎকাজ করে, তার জন্য কোন ভয় নাই এবং ( পরিণামে ) তাকে আক্ষেপও করতে হবে না।"

পুনশ্চ সুরা নাজেয়াতের ৪০ ও ৪১ আয়েতে তিনি বলছেন :—

و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى (لا)

فان الجنة هي المأوى (ط) ۔

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ( আল্লাহ্‌র শাস্তি বা অসন্তুষ্টিকে ) ভয় করে এবং ( তদ্ধেতু ) কুপ্রবৃত্তি দমন করে, স্বর্গ তারই বাসস্থান।"

পুনরপি সুরা মোজ্জাম্মেলের ১১৯ আয়েতে তিনি বল্‌ছেন :—

و اقيموا الصلوة و اتوا الزكوة و اقرضوا الله قرضا حسنا (ط)

অর্থাৎ তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য "নামাজ প্রতিষ্ঠা কর, জাকাৎ প্রদান কর ও আল্লাহ্‌কে কর্জ্জহাসানা দেও।" তিনি বল্‌ছেন যে সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটে-লিপ্ত মানুষের পক্ষে দৈনন্দিন কার্য্যের জন্য ইহাই যথেষ্ট হবে। বিষয়টী পরিষ্কার করার জন্য আমরা এখানে এই সুরার সারমর্ম্ম প্রদান কর্‌ছি। আল্লাহ্‌ এই সুরায় প্রদত্ত বিষয় হজরত মোহাম্মদকে ( দঃ ) সম্বোধন ক'রে বলেছেন এবং তাঁর যোগে সমস্ত মানবমণ্ডলীকে জানা'য়েছেন। তিনি তাঁকে বলেছেন যে শেষরাত্রে উ'ঠে নামাজ পড়া অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার হলেও তোমাকে তা কর্‌তে আদেশ দিচ্ছি এই হেতু যে দিনের বেলা তোমার কাজের অন্ত নাই এবং নিস্তব্ধ শেষ রাত্রেই অনন্যমনা হয়ে তোমার ক্ষমা-প্রার্থনা ও নিবেদন করার এবং আমার পরামর্শ গ্রহণ করার একমাত্র উপযুক্ত সময়। এই আদেশ অনুসারে তিনি শেষ রাত্রে উপাসনা করা আরম্ভ ক'রে দেন। তাঁর নামাজ পড়া দেখে তাঁর অনুচরবর্গও শেষ রাত্রে তাঁর সঙ্গে নামাজ আরম্ভ করেন। তাঁরা রাত্রির এক

তৃতীয়াংশ, কখন অর্দ্ধেক রাত্রি, কোন কোন দিন, এমন কি, রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ নামাজে অতিবাহিত কর্‌তে থাকেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ দেখ্‌লেন যে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'তে চলেছে; কেননা, রাত্রি বিশ্রামের সময়, কাজের সময় নহে, অধিকন্তু এপ্রকারের কার্য্যে এবাদতকারীদের স্বাস্থ্য অটুট থাকৃতে পারেনা। তাই তিনি এই সুরার শেষভাগে হজরত রছুলে করিমকে পুনঃ সম্বোধন ক'রে তাঁর যোগে তাঁর অনুচরদিগকে জানাচ্ছেন "আমি দিন ও রাত্রি নির্দ্দিষ্ট করেছি উদ্দেশ্য বিশেষের জন্য; আমি জানি এরূপ ভাবে তোমরা একাজ বেশী দিন চালা'তে পার্‌বেনা; আমি জানি তোমাদের রোগ-ব্যাধি আছে, জীবিকার্জ্জন আছে, জ্ঞানান্বেষণ আছে এবং আমার পথে চল্‌তে বাধাবিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম আছে। অতএব, আমি তোমাদিগকে আদেশ কর্‌ছি যে শেষ রাত্রির নামাজ তোমরা যতটুকু পার পড়ো, আমি উহা তোমাদের ইচ্ছাধীন ক'রেছি। দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের জন্য নিম্নোক্ত তিনটী বিষয়ই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং তাতেই তোমরা অগণিত পুরস্কার পাবে। সে তিনটী বিষয় এই—(১) (অবশ্য কর্ত্তব্য) নামাজ, (২) (অবশ্য কর্ত্তব্য) জাকাৎ ও (৩) আমাকে কর্জ্জ দান। (বলা বাহুল্য যে রমজানের রোজা ও হজ্জ্‌ দৈনন্দিন ব্যাপার নহে।) কর্জ্জদানের অর্থ হচ্ছে এই যে 'যা প্রদান করা যায় তা প্রত্যর্পণের দাবী করা যেতে পারে।' আল্লাহ্‌কে কর্জ্জদান হচ্ছে তাঁর সত্যসনাতন-ধর্ম্ম-রক্ষার্থ ত্যাগ স্বীকার; বিপদগ্রস্তকে সাহায্যদান; অন্নের জন্য উপবাসে হাহাকার কর্‌ছে এমন ব্যক্তিকে অন্নদান; শতগ্রন্থি-যুক্ত বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ কর্‌তে

পার্‌ছেনা এমন ব্যক্তিকে বস্ত্রদান; ইত্যাদি। আল্লাহ্‌ বল্‌ছেন যে মানুষের এসমস্ত দান তাঁর নিকট গচ্ছিত থাক্‌বে, তারা উহার প্রত্যর্পণের দাবী কর্‌তে পার্‌বে। তিনি আরও বল্‌ছেন যে উপরি উক্ত তিনটী কর্ত্তব্য সম্পাদনেও যদি কেহ কোন দিন কোন কারণে অপারগ হও, অকপটে ও ঐকান্তিকতার সহিত অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করো, মনে রেখো আমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল।" ইহার প্রতি ছত্রে তাঁর বান্দার জন্য তাঁর দয়া ও ভালবাসা যেন উছ্‌লে পড়্‌ছে! বস্তুতঃই, প্রেমময় হে, দয়াময় হে, তোমার ভালবাসা সমুদ্রের মত গভীর, অতল স্পর্শ, এবং তোমার দয়া উহারই মত অপার ও অনন্ত!!

কেহ হয়ত বল্‌বেন যে এত দয়া যেখানে সেখানে নামাজ হ'তে অব্যাহতি দিলেইত পারেন। সকলের জেনে রাখা উচিত যে মানুষ নামাজ পড়্‌বে তারই মঙ্গলের জন্য, কেননা আল্লাহ্‌ বল্‌ছেন যে "নামাজ তাঁকে স্মরণ করা, যা মানুষকে সমস্ত পাপ হ'তে দূরে রাখে"—সুরা আন্‌কাবুতের ৪৫ আয়েত। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে রমজানের রোজা ও হজ্জ্‌ দৈনন্দিন কর্ত্তব্য নহে; রোজা বার মাসে একমাস অবশ্য কর্ত্তব্য (ফর্‌জ্‌) আর হজ্জ্‌ জীবনে একবার ফর্‌জ্‌, সুতরাং দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যে আল্লাহ্‌ উহাদের উল্লেখ না করায় কেহ যেন মনে না করেন যে তিনি মানুষকে রোজা ও হজ্জ্‌ হ'তে অব্যাহতি দিয়েছেন।

এতদ্‌সঙ্গে আমরা সুরা মোমেনুনের প্রথম ১১ আয়েতও পাঠ কর্‌তে সকলকে অনুরোধ করি। ঐ একাদশ আয়েতের সার মর্ম্ম এই:—"বিশ্বাসীরাই প্রকৃত সুখী, যারা আন্তরিকতার সহিত উপাসনা

করে (লোক দেখানের জন্য নহে); যারা অসদালাপ হ'তে দূরে থাকে; যারা দান করে; যারা সংযম ও সম্ভ্রমশীল (বেহেয়ামী হ'তে দূরে থাকে); যারা গচ্ছিত বস্তুর অপলাপ করে না (আমানতের খেয়ানৎ করেনা) এবং প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী নহে; যারা রীতিমত উপাসনাকারী—ইহারাই স্বর্গবাসের অধিকারী, ইহারাই চিরকাল উহাতে বাস কর্‌বে।"

ইহার পরে কেহ কি বল্‌তে পারেন যে যথাযথ নামাজ পড়্‌লে, জাকাৎ দিলে, ঠিক ভাবে রোজা রাখ্‌লে, হজ্জ্ সমাপন কর্‌লে ও আল্লাহ্‌কে কর্জ্জহাসানা দিলে মুসলমান বেহেস্তনসীব হবে না? যদি হয় (আল্লাহ্ চাহেত হবে). তা হলে **সাধারণ অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ লোকের যে সে পীর ও ফকিরের** (বলা বাহুল্য যে খাটী বা আসল উপযুক্ত পীরেরা যাকে তাকে মুরিদ করেননা) **নিকট মুরিদ হওয়ার কি আবশ্যকতা ও সার্থকতা আছে?** এবং **যে বয়েৎ ফরজ নয়, ওয়াজেব নয়, এমন কি সুন্নতে মওয়াক্কেদাও নয় অর্থাৎ ইচ্ছাধীন, তার জন্য এত পীড়াপীড়িই বা কেন?**

তাই আমরা পীর, ফকির ও মুরিদানের নিকট সনির্ব্বন্ধ নিবেদন করি যে তাঁরা আপাততঃ মার্‌ফতি দূরে রে'খে শরিয়ৎ বা নামাজ, জাকাৎ, রোজা, দান খয়রাৎ প্রভৃতি ও ইল্‌ম্ বা শিক্ষার দিকে অখণ্ড ও সম্পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করুন। গোড়াপত্তন আগে ভাল ক'রে করা হোক্, ভিত্তি প্রথমে সুদৃঢ় ও মজবুত করা হোক্, তবে

ত ইমারত উঠবে! নিজেরাও সুশিক্ষিত নহেন, চেলারাও অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, মুরিদানও অজ্ঞ—সবই অশিক্ষিত ও অজ্ঞের দল হলে যে শয়তানের জয়জয়-কার হবে! তার সামান যে চতুর্দ্দিকে প্রস্তুত হচ্ছে তা কি নজরে পড়ে না?

আর একটী কথা বল্‌লেই আমাদের মন্তব্য শেষ হয়। উহা এই যে আল্লাহ্ বলেছেন যে তিনি ব্যতীত আর কাহারও লোকের ইষ্টানিষ্ট করার ক্ষমতা নাই, তাই তিনি তাঁর রছুলের দ্বারা বলা'য়েছেন সুরা জ্বিনের ২১ আয়েতে:—

قل انی لا املک لکم ضرا و لا رشدا -

বঙ্গানুবাদ এই "বল, নিশ্চয় আমি তোমাদের ইষ্ট ও অনিষ্ট করিতে সক্ষম নহি।" পবিত্র ঐশী মহাগ্রন্থ কোর্‌আনের এই উক্তি পাঠ করার পরে কি কোন ইমানদার ব্যক্তি বল্‌তে পারেন বা বিশ্বাস কর্‌তে পারেন যে, যা হজরত রছুলে করিমের ক্ষমতায় নাই তা দর্গা ও মাজারে সমাহিত মহাপুরুষদিগের এবং পীর ও ফকিরের ক্ষমতায় আছে? স্বীয় রছুলের দ্বারা আল্লাহ্‌র এ কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে কেহ যেন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের প্রতি এরূপ ক্ষমতার আরোপ না করে যা তিনি তাহাদিগকে প্রদান করেন নাই, যথা '**প্রার্থনা কবুল করার ক্ষমতা**।' আসল কথা এই যে আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হবে যে **মানুষ কেবল উপলক্ষ** (**instrumentality**) **বই নহে**।

আরও বিশেষ প্রণিধানের বিষয় এই যে পীর, অলি প্রভৃতির প্রতি অতি-ভক্তি যে ঘটনাক্রমে একদিন সেই অতিভক্তের সর্ব্বনাশ সাধন না ক'রে বস্‌বে তা কে বল্‌তে পারে? ধরুন, হজরত বড় পীর সাহেবের অতিভক্ত কোন এক ব্যক্তি দৈবাৎ ব'লে ফেল্লেন বা মনে মনে কল্পনা কর্‌লেন যে পীর সাহেবের বদৌলতেই ( কৃপায়েই ) তাঁর একাজ সুসিদ্ধ হ'ল, তা'হলে সেদিন তাঁর কি দশা হবে তা ধীর চিত্তে একবার চিন্তা ক'রে দেখুন। সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ্‌ তাই বোধ হয় মানুষকে সতর্ক ক'রে দেওয়ার নিমিত্ত হজরত রছুলে করিমের দ্বারা উল্লিখিত উক্তি করায়েছেন। সুলতান এব্‌নে সাউদ কর্ত্তৃক কবর ও মাজার ভগ্ন করারও একটা অজুহাত এই ছিল যে লোকে বেদাৎ কর্‌তে কর্‌তে শির্ক পর্য্যন্ত ক'রে বসে। আমাদের মতে এমন জিনিষ যা একদিন সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌তে পারে তা নিয়ে খেলা করা আর ছেলেদের আগুন নিয়ে খেলা করা একই কথা। এ হ'ল ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে, আর শাফা-আত্‌ সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে যথাস্থানে বিস্তৃত সমালোচনা করেছি। অতএব, মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ সমীপে আমাদের সবিনয় নিবেদন যে তাঁরা এই পুস্তকে বর্ণিত বিষয়গুলি যথাযথরূপে বিচার ক'রে নিজেদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।

সমাপ্ত